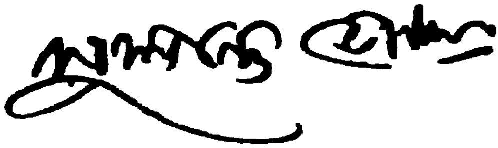
উৎসর্গ

গীতা চট্টোপাধ্যায়

স্নেহভাজনেষু



লেখকের অন্যান্য বই

শ্বেত পাথরের টেবিল

পায়রা

নগেন ভেবেছিল একটু তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বেরিয়ে ভিড় ভাঙার আগেই বাস, ট্রাম, ট্যাক্সি, মিনি, হাতের কাছে যা পায় তাইতেই চেপে বসবে। কিছু কেনাকাটাও ছিল। এক প্যাকেট ভাল বিস্কুট, মিষ্টি আপেল, লেবু, বেদানা ইত্যাদি। আজকাল অফিসপাড়াতেও ফল-পাকড় ভালই পাওয়া যায়। অফিসের প্রায় দোরগোড়াতেই ফলের বাজার। সুতরাং চিন্তার কিছু নেই। কিন্তু শেষ মুহূর্তে একটা বিল এসে পড়ায় সমস্ত হিসেব গণ্ডগোল হয়ে গেল। বিলটা করে দিয়ে না গেলে কাল আবার ক্লিয়ারেন্সে দেরি হয়ে যাবে।

বেয়ারা চা দিয়ে গিয়েছিল। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতেই নগেন এত কাজ করছিল। চারটে প্রায় বাজতে চলেছে। আধ ঘণ্টার মধ্যে বেরোতে না পারলে অফিসপাড়া ছেড়ে বেরোতে ঘণ্টা দুয়েক লেগে যাবে।

সেই সাড়ে চারটেই বেজে গেল। নগেন যখন বাইরের রাস্তায় পা রাখল তখনই বাসে ট্রামে ভিড় শুরু হয়ে গেছে। তার খেয়াল ছিল না, ময়দানে আজ আবার কিসের একটা সভা আছে। এতক্ষণে হয়তো দিক-বিদিক থেকে মিছিল আসতে শুরু করেছে। মিছিল মানেই জ্যাম। একবার জ্যামে পড়ে গেলে হাঁটা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না।

নগেন দ্রুত ফলবাজারের দিকে এগিয়ে গেল। এখন বাছবিচারের আর বেশি সময় নেই। আপেল কেনা সহজ কাজ নয়। কোন আপেল যে টক হবে, কোন আপেল মিষ্টি, ওপর দেখে বলা শক্ত। জীবনে দর-দস্তুর করে কিছু কেনা নগেনের কোষ্ঠীতে লেখেনি। যা দাম বললে

তাই। কোল্ড স্টোরেজের লেবু, দেখলেই বোঝা যায়। কেমন একটা ফ্যাকাসে, ফোলা ফোলা, অ্যানিমিক রোগীর মতো চেহারা। গায়ে বিন্দু বিন্দু শিশিরের ফোঁটা। বেদানার দেখা পাওয়া গেল না। সময় কম, কোথায় খুঁজবে! টাকা দিয়েছিল নগেন, ফেরতপয়সা না গুনেই পকেটে ফেলে দিল। অত হিসেবনিকেশ তার পোষায় না। মাঝে মাঝে মনে হয়, তার মনের আসনে এক সম্রাট বসে আছে, ছোটখাটো ব্যাপারে যার কোনো নজর নেই। এই ভাবেই নগেনের জীবন চলে আসছে।

বুকে ফলের ঠোঙা চেপে ধরে নগেন নেতাজী সুভাষ রোড ধরে বি.বা.দি. বাগের ট্রাম টার্মিনাসের দিকে এগোলো। ট্রাম পেয়ে গেলে মন্দ হয় না। তবু একটু পরিচ্ছন্ন ভাবে যাওয়া যায়। টার্মিনাসে এসে নগেন তার ভুল বুঝল। ট্রামের বোধহয় অনেকক্ষণ দেখা নেই, ভিড় দেখেই বোঝা যায়। নগেন ট্রামের আশা ছেড়ে শাট্‌ল ট্যাক্সির সন্ধানে দৌড়ল। বেঙ্গল চেম্বারের কাছে ট্যাক্সি পাওয়া যায়। দূর থেকে নগেন দেখল একটা ট্যাক্সি বেরিয়ে যাচ্ছে। আফসোস হল। একটু আগে চেষ্টা করলে এইটাতেই হয়তো জায়গা পেয়ে যেত।

মোড়ের কাছে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই ব্র্যাবোর্ন রোডের দিক থেকে আর একটা ট্যাক্সি বাঁক নিল। নিলে কি হবে কিছু লোক যেন সব সময় মুখিয়ে থাকে। পাঁচ-ছজন ঊর্ধ্বশ্বাসে গাড়িটার দিকে দৌড়ল। অন্য সময় হলে নগেন ওই লাঠালাঠির মধ্যে যেত না। কিন্তু তার উপায় ছিল না। স্বভাববিরুদ্ধ কাজই তাকে করতে হল।

ট্যাক্সিটার দিকে নগেন মরিয়া হয়ে এগিয়ে গেল। জীবনে যা কখনো করেনি তাই আজ করল। একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোককে প্রায় ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে সামনের সিটে বসে পড়ল। নিজেকে তার ভীষণ অপরাধী মনে হল। বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকাবার সাহস হল না। মুখ নিচু করে আপেলের ঠোঙার গায়ে কি একটা লেখা রয়েছে সেই দিকে চেয়ে রইল। কোনো শিশুর হাতের আঁকা ছবি। কি যে আঁকতে চেয়েছিল, গাছ কিংবা নদী অথবা কোনো রাজপথ। নগেনের পাশে যে ভদ্রলোক বসেছেন, নগেনের

দ্বিগুণ চেহারা। ভদ্রলোক ভাদ্রের গরমে প্রচুর ঘেমেছেন। কি একটা সেন্ট মেখেছেন, ঘামের গন্ধের সঙ্গে মিশে নগেনের নাকে লাগছে। ভদ্রলোকের কোলে রাখা ব্রিফকেস নগেনের হাঁটুতে চেপে আছে। আর একদিকে পাঞ্জাবী ড্রাইভারের কাঁধের সঙ্গে তার কাঁধ সেঁটে গেছে। ডান উরুতে গিয়ারের গোল মাথাটা লাগছে। নগেন প্রায় স্যাণ্ডউইচ হয়ে গেছে। অন্য সময় হলে সে এই অস্বস্তিকর পরিবেশ থেকে নেমে যেত। আগে কত দিন এমন ঘটনা ঘটেছে, বাসে বা ট্রামে টিকিট কেটে কিছুদূর গিয়ে সে জায়গা ছেড়ে নেমে গেছে। জীবনের কোনো পরিস্থিতিতেই সে অস্বস্তি বরদাস্ত করতে পারেনি। অশান্তিও সে চায় না। দু-দশ মিনিটের যাত্রাপথে সহযাত্রীর সঙ্গে বসা বা দাঁড়ানো নিয়ে হৈ হৈ করার চেয়ে নিজেকে মুক্ত করে নেওয়াই ভাল। এইভাবে সরতে সরতে সে হয়ত জীবন থেকেই সরে গেছে। গোলাপেরও যে কাঁটা থাকে এই সত্যকে অস্বীকার করে বসে আছে। নগেনের হঠাৎ খেয়াল হল যে বৃদ্ধ ভদ্র-লোককে সে মৃদু ধাক্কা মেরেছিল, তার পাশে বসে থাকা মোটা ভদ্রলোকও নিশ্চয়ই তাঁকে প্রচণ্ড ধাক্কা মেরে এই আসন সংগ্রহ করেছেন। ভদ্রলোকের জন্যে তার করুণা হল, সেই সঙ্গে তার নিজের অপরাধ-বোধটাও যেন খানিক হালকা হয়ে গেল। পৃথিবী জুড়ে ধাক্কা খাবার লোকের যেমন অভাব নেই, ধাক্কা মারার লোকেরও অভাব নেই। ধাক্কা যে খাবে সে নগেনের হাতে না খেলেও অন্য কারুর হাতে খাবে।

নগেনের মনে হল এখন সে একটা সিগারেট খেতে পারে; কিন্তু সিগারেট সে ধরাস না। এই রুদ্ধশ্বাস পরিবেশে একটা সিগারেট হয়ত তাকে তৃপ্তি দেবে কিন্তু ধোঁয়া আর ওড়া ছাই অন্যান্য যাত্রীর অসুবিধের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। অন্যের সম্পর্কে বেশি সচেতনতা নগেনের চরিত্রের একটা গুণ না দোষ সে ঠিক বুঝতে পারে না। তবে এটা সে বুঝেছে এর ফলে তার নিজের জীবনের বৃত্ত ক্রমশই ছোট হয়ে আসছে। পরিসর খুব সীমিত হয়ে পড়ছে। জীবনের হিসেব মেলাবার মতো বয়স এখনও তার হয়নি। এখনও তার সামনে অনেকটা পথ পড়ে আছে। অসহ্য

গরমে আর চাপে ডান দিকের রগের কাছটায় ভার বোধ হচ্ছিল। সন্ধ্যের দিকে মাথাটা হয়ত ধরবে। মাথার চিন্তাটাও নগেন মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল। যখন ধরবে তখন দেখা যাবে

বাইরে তাকিয়ে দেখল গাড়ি তখন পার্ক স্ট্রীটের মুখে লাল আলোয় ঠেকে গেছে। আর কিছুক্ষণ পরেই সে নেমে পড়বে। বুকপকেটে হাত দিয়ে খুচরো টাকা আছে কিনা দেখে নিল। দশ টাকার নোট থাকলে আবার কিছুক্ষণ চেঞ্জ নিতে দেরি হয়ে যাবে। মনে পড়ল খুচরো টাকা আছে, আপেল কেনার সময় সে একটা দশ টাকার নোট ভাঙিয়েছিল। ফেরত টাকা আর খুচরো সব একসঙ্গে না গুনেই সে বুকপকেটে ফেলে রেখেছে। এই অভ্যাসটা তার আর গেল না। না গুনে পয়সা ফেরত নেওয়া। এই অভ্যাসের জন্যে সে কতবার মল্লিকার কাছে কথা শুনেছে। বহুবার পয়সার গোলমাল হয়েছে। স্বভাবটা তার আর কিছুতেই শোধরাল না। নিজে খুব একটা বড়লোক নয় কিন্তু জীবনের কতকগুলো ব্যাপারকে তার মিডল ক্লাস মেনটালিটি বলে মনে হয়। মাঝে মাঝে তার মনে হয়, মনের আসনে যেন কোনো সম্রাট বসে আছে। সেই সম্রাট হয়ত তার জীবনের সঙ্গে সঙ্গে এত দিনে বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে কিন্তু তার প্রতাপ এতটুকু কমেনি।

সার্কুলার রোডের মুখটায় নগেন ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়ল। নামবার সময় কাপড়ের পায়ের দিকটা গাড়ির একটা কিছুতে লেগে একটু ছিঁড়ে গেল। তার বেশির ভাগ কাপড়ের পাড় আর পাঞ্জাবির পকেট এই ভাবেই ছেঁড়ে। তার মানে এই নয় যে সে অসতর্ক। বরং ঠিক তার উল্টো, সব ব্যাপারেই সে একটু বেশি সতর্ক। আপেলের ঠোঙাটা বুকে চেপে ধরে এগোতে গিয়েই খেয়াল হল, সে একটা ভুল করেছে। এক প্যাকেট ভাল বিস্কুট কেনার কথা ছিল। চকোলেট কিনতে হবে না কারণ চকোলেট বা চোখা মিষ্টি জাতীয় কোনো কিছু খাওয়া বারণ হয়ে গেছে। একটু পিছিয়ে গেলেই বড় একটা দোকান রয়েছে কিন্তু দেরি হয়ে যাবে। নগেন এদিক-ওদিক তাকিয়ে রাস্তা পার হল।

পশ্চিমের আকাশে এক খণ্ড শরতের মেঘ উঠেছে। পাড়ে সোনালী জরির কাজ। সারাদিনের প্রচণ্ড ভ্যাপ্‌সা গরমের পর একটু ঠাণ্ডা বাতাস সবে বইতে শুরু করেছে। গাড়িতে ওই ইঞ্জিনের গরম আর ঠাসাঠাসি বসে থাকার পর বাতাসটা নগেনের বেশ ভালই লাগছিল। রগের যন্ত্রণাটাও যেন একটু কমল। পড়ন্ত বেলার রোদটা অবশ্য সমানে মুখে এসে পড়ছিল। তবে এদিকটায় গাছপালা বেশি বলে তেমন অসহ্য লাগছিল না। সিগারেট খাবার ইচ্ছেটা আবার প্রবল হল। নগেন কিন্তু সিগারেট খেল না। সময়ের সঙ্গে জীবনে সে এভাবে কখনো ছোটেনি। মনে আছে, সময়ে ট্রেন ধরার ভয়ে সে কতবার বাইরে যাবার সুযোগ ছেড়ে দিয়েছে। অফিসে কখনো তার সময়ে যাওয়া হয়নি। এ নিয়ে প্রথম প্রথম কিছু গোলমাল হলেও পরে অফিস বুঝেছিল এই লোকটির আসার যেমন সময় নেই যাবারও তেমনি সময় নেই। কাজের ব্যাপারে ও একাই একশ। এমন লোককে সময়ের বাঁধনে বাঁধা চলে না। সময় বুঝি তাই এখন প্রতিশোধ নিচ্ছে। নগেন নিজের মনেই বলল, কিছু পাখি খাঁচায় বাঁধা পড়ে কিন্তু সুযোগ পেলেই কেটে বেরিয়ে যায়। দেখা যাক আমারও দিন আসবে।

পি.জি.-র সামনে পৌঁছে নগেন চট করে একবার ঘড়িটা দেখে নিল। আধ ঘণ্টার ওপর ভিজিটিং আওয়ার্স শুরু হয়ে গেছে। ঠিক ওঠার সময় অফিসে ওই বিল দুটো না এলে তার এই আধ ঘণ্টা সময় নষ্ট হত না। নগেন মনে মনে হিসেব করে দেখল এখনও প্রায় দশ বছর তাকে চাকরি করতে হবে। যত দাপটেই চাকরি করুক, যত স্বাধীনতাই থাক না কেন, চাকরি চাকরিই। এক ধরনের দাসত্ব। জীবনের শুরুতেই চাকরি ছাড়া সে অন্য কিছু করতে পারত। স্বাধীন কিছু। ব্যবসা-ট্যাবসা কিংবা শিল্প। অনায়াস জীবনের লোভেই সে চাকরি নিয়েছিল। টাকা-পয়সার ব্যাপারটা চিরকালই সে কম বোঝে। কোনোমতে দিন চলে গেলেই সন্তুষ্ট। অ্যামবিশানটা তার বরাবরই একটু কম। চাকরি-জীবনেও যে পথে চললে মানুষ উন্নতির শেষ সীমা ছুঁতে পারে, সে রাস্তায় নগেন রেসের

ঘোড়ার মতো দৌড়তে চায়নি। জীবনসংগ্রাম কথাটা সে সব সময়েই খুব আলতোভাবে উচ্চারণ করেছে, জীবন নিয়ে রসিকতা করেছে, ঠাট্টা করেছে কিন্তু সিরিয়াস হতে পারেনি। এই ব্যাপারে বাবার চরিত্রের সঙ্গে তার মিল আছে।

পি.জি.-তে ঢোকার মুখে এখন আর তেমন দর্শনার্থীর ভিড় নেই। সকলেই ঢুকে পড়েছেন। সকলেই এখন রোগীদের বিছানার পাশে গিয়ে বসে পড়েছেন। লম্বা সিঁড়ির ধাপে ধাপে কয়েকজন হাসপাতাল কর্মী অলসভাবে বসে আছেন। একজন সিস্টার শাড়ির সামনের দিকটা অল্প একটু তুলে সাবধানে নেমে আসছেন। মুখে একটা বিষণ্ণ ক্লান্তির ছাপ। ডিউটি বোধহয় শেষ, স্টাফ কোয়ার্টারের দিকে হেঁটে চলেছেন। ভদ্রমহিলার অলস হাঁটার ভঙ্গির দিকে নগেন এক মুহূর্ত চেয়ে থেকেই দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে গেল। বেশ বুঝতে পারে, যে কোনো মধ্যবয়সী মহিলার মধ্যে সে এখন মল্লিকাকে খোঁজে। কেন জানে না, তার ধারণা হয়েছে, পৃথিবীর কোথাও আর একটা মল্লিকা থাকা অসম্ভব নয়। মল্লিকার চেহারা যেন ক্রমশই সে ভুলে আসছে, অস্পষ্ট হয়ে আসছে। কোনো তরুণীকে দেখলেই সে আজকাল মাঝে মাঝে তাকায়, মল্লিকার সেই অল্প বয়সের চেহারাটা যদি হঠাৎ খুঁজে পায়—প্রথম যেদিন মল্লিকা এসেছিল তার ঘর করতে। তারপরই হঠাৎ তার খেয়াল হয় কোনো মহিলার দিকে এইভাবে তাকিয়ে থাকা খুবই অশোভন। নগেন চোখ ফিরিয়ে নেয়। এমন যদি হত, জীবনের সুখের মুহূর্তদের ইচ্ছেমত আবার ফিরিয়ে আনা যেত! একই জীবনে একাধিকবার প্রবেশ করা সম্ভব হত!

নগেন বোধহয় একটু অন্যমনস্কই হয়ে পড়েছিল। তা না হলে এতটা চমকে ওঠার কোনো কারণ ছিল না। হাসপাতালের পরিবেশের সঙ্গে সে ইতিমধ্যেই পরিচিত হয়ে পড়েছে। কত ধরনের অসুখ থাকতে পারে, কত ধরনের মৃত্যু, হাসপাতালে না এলে তার জানা হত না। ওয়ার্ডে ঢোকার মুখেই প্রশস্ত লবিতে ঘটনাটা ঘটল। আর একটু হলে ট্রলিটার সঙ্গে তার ধাক্কাই লেগে যেত। জমাদাররা ওয়ার্ড থেকে আপাদমস্তক

সাদা চাদর ঢাকা একটা মৃতদেহ মর্গের দিকে নিয়ে চলেছে। মৃত্যুকে এত অনায়াসে বহন করা একমাত্র হাসপাতালেই সম্ভব। এখানে মরতে মরতে মানুষ মরণটাকে একদম শেষ করে দিয়েছে। নগেন ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, সাদা চাদর ঢাকা ট্রলিটা তখন অনেক দূরে পথের বাঁকে এগিয়ে গেছে। নগেনের সামনের দিকটা পশ্চিম, সেই পশ্চিমের কোনো একটা স্কাইলাইট বেয়ে পড়ন্ত বেলার রোদ গুটিগুটি নেমে এসে মেঝের উপর হামাগুড়ি দিয়ে সেই মৃত্যুর পেছনে পেছনে এগিয়ে গেছে। সোনালী পথে মৃত্যু এমন ভাবে গড়িয়ে গেল, নগেনের মনে হল, মৃত্যু যেন সোনালী আগুনের আঁচল উড়িয়ে চলে গেল। জীবনে মৃত্যুকে সে খুব কাছ থেকে দেখেনি যেমন দেখছে এই কয়েক বছর। যখন মা মারা গিয়েছিলেন তখন সে খুব ছোট, বোধহয় তখন তার বয়স বছর তিনেক। বাবা এখনো জীবিত। কাশীবাসী। প্রথম মৃত্যু যা সে খুব কাছ থেকে দেখল তা হল মল্লিকার। মল্লিকা যখন মারা গেল তার মাথাটা ছিল নগেনের কোলে। মল্লিকা এমন সহজে হাসতে হাসতে চলে গেল— অনেকটা কর্পূরের মতো। নগেনের হাতেই ছিল, হঠাৎ দেখল নেই। নগেন তখনও কথা বলছিল, মল্লিকা কিন্তু ছিল না। কত কথাই যে বলছিল সেদিন নগেন! একটানা সাতদিন বৃষ্টির পর সেদিনই একটু রোদ উঠেছিল।

নগেন আর মল্লিকা যে ঘরে থাকত, সেটা একতলায়। ঘরের পশ্চিমে একটা ছোট বাগান ছিল। রোদ আসার জন্যে ঘরের সমস্ত জানলা সেদিন খুলে দিয়েছিল নগেন। ঘরটা পূর্ব পশ্চিমে লম্বা ছিল, উত্তর দক্ষিণে কিছুটা ছোট। নগেন খাটটাকে রেখেছিল পশ্চিম ঘেঁষে উত্তর দক্ষিণে লম্বা করে। দক্ষিণে মাথার দিকে একটা বড় জানলা ছিল, উত্তরে পায়ের দিকেও একটা ছোট জানলা ছিল। পশ্চিমের জানলাটা দক্ষিণের মতোই বড়। পশ্চিমের জানলাটা সব সময় খোলার প্রয়োজন হত না কারণ দক্ষিণ থেকে প্রচুর বাতাস এসে উত্তরের জানলা দিয়ে বেরিয়ে যাবার পথ করে নিত। পুবেও একটা একপেশে

জানলা ছিল। নগেনের নির্দেশ ছিল শোবার ঘরে যেন অজস্র ফার্নিচার না থাকে। শোবার ঘর হবে ছিমছাম, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। একটা ড্রেসিং-টেবিল একপাশে থাকে থাক। একটা ছোট ওয়ার্ডরোব। গোটা কতক ভাল ছবি দেয়ালে, একটা রুচিসম্পন্ন ক্যালেণ্ডার। পায়ের তলায় ঘরের খোলা অংশে একটা ছোট কার্পেট পাতা যেতে পারে।

ঘরটা নগেন যেমন চায় সেই ভাবেই সাজানো ছিল। মাথার দিকের দেয়ালে ছিল মার ছবি, তার ঠিক তলায় ছিল তাদের একমাত্র মেয়ে উল্কার একটা ছবি। ছবিতে উল্কা বসে ছিল। পায়ের দিকের দেয়ালে ছিল তাদের বিয়ের পর তোলা স্বামী-স্ত্রীর ছবি। এই ছবিটা নিয়ে মল্লিকার সঙ্গে তার মাঝে মাঝে ঝগড়া হত। নগেন বলত, 'স্বামী-স্ত্রীর নেকা নেকা ছবি ঝুলিয়ে রাখাটা খুব রুচির পরিচয় দেয় না, ওটা খুলে রাখ।' মল্লিকা রেগে যেত, 'তোমার সব কথা মানতে রাজী আছি এই কথাটা ছাড়া, যখন আমি থাকব না, দেখবে এই ছবিটার মূল্য তখন কত বেড়ে যাবে!' নগেন কোনো উত্তর দেয়নি, মনে মনে ভেবেছে মেয়েদের বিশ্বাসের কি জোর? মল্লিকা কি করে ভাবল যে, সে-ই আগে যাবে, আর নগেন মল্লিকার স্মৃতি নিয়ে বাকি জীবনটা বসে থাকবে! ভালবাসার এদিক-ওদিক হতে কতক্ষণ! মল্লিকা বেঁচে থাকতে থাকতেই নগেন তো অন্য কোনো প্রলোভনে জড়িয়ে যেতে পারে! পুরুষরা যে কোনো সময়েই এক নারীতে সন্তুষ্ট নয়, সে তথ্য কি মল্লিকার অজানা! নগেন সেদিন হেসেছিল, মেয়েরা সব সময়েই কেমন নিঃশঙ্ক। সহজেই কেমন ভেবে নিতে পারে আমৃত্যু সংসারে তার একারই আধিপত্য থাকবে, আর কেউ অংশীদার এসে জুটে যাবে না। নগেনের মনে আছে এই ছবিটা নিয়ে একবার কেলেঙ্কারির একসা হয়েছিল। কি একটা ব্যাপারে কথা কাটাকাটি হতে হতে দুজনেরই রাগ চরমে উঠেছিল। নগেনের মুখ ফসকে বেরিয়ে গিয়েছিল, 'তোমার ওই মুখ আর আমি দেখতে চাই না।' 'বেশ, তাই হবে,' মল্লিকার চোখ দুটো তখন অভিমানে চিকচিকে হয়ে উঠেছে। মল্লিকা সেই দিনই বাপের বাড়ি চলে গিয়েছিল। নগেন বাধা

দেয়নি। কেন সে খোশামোদ করবে? মেয়েছেলের অত বাড় ভাল নয়।

একদিন গেল, দু'দিন গেল মল্লিকার কোনো খবর নেই। নগেন দিনের বেলায় মল্লিকার অভাব তেমন বুঝতে পারত না, কাজে কাজে হৈ-হট্টগোলে কেটে যেত। সন্ধ্যের পর বাড়ি ফিরলেই নিজেকে ভীষণ নিঃসঙ্গ মনে হত। চা খেত, বসে বসে বই পড়ত। তারপর যত রাত বাড়ত মল্লিকার কথা মনে পড়ত—সে এখন কি করছে? হয়ত সিনেমায় গেছে কিংবা বোনেদের সঙ্গে হৈ হৈ করছে অথবা ওদের বাড়িতে বিশু বলে যে চ্যাংড়া ছেলেটা প্রায়ই আসে তার মজার মজার কথা শুনে হেসে গড়িয়ে পড়ছে। মল্লিকার কথা ভাবতে ভাবতে নগেন এমন একটা মানসিক অবস্থায় এসে পড়ত যাকে বলা চলে ঈর্ষা আর অভিমানের ঘনীভূত মিশ্রণ। খাবার টেবিলে রাঁধুনী কখন খাবার চাপা দিয়ে রেখে গেছে। সে সব খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। অ্যাশট্রেতে একের পর এক সিগারেটের শেষ অংশ জমছে। মাথার উপর আলোর কাছে ধোঁয়ার একটা ফিকে আঁচল উড়ছে। রাত্রির এমনিই একটা নিজস্ব দুর্বলতা আছে। সেই সময় মানুষের মনের আনাচ-কানাচ থেকে প্রবৃত্তিরা সরীসৃপের মতো একে একে বেরিয়ে আসতে থাকে। নগেন ধরেই নিল, মল্লিকার সঙ্গে তার সমস্ত সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে। মল্লিকা শুধু স্বার্থপর নয়, সে এত দিন ধরে শুধু অভিনয় করে এসেছে! ভাবনাটাকে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করার পর সেটা একটা সত্যের চেহারায় সেই মধ্যরাতে নগেনের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'তুমি ঠিকই ভেবেছ।' নগেনের সমস্ত রাগ তখন সেই ছবিটার উপর গিয়ে পড়ল। তার মনে হল ছবিটা একটা প্রচণ্ড উপহাস। নগেন সেই রাতেই ছবিটা দেয়াল থেকে সরিয়ে ফেলল।

পরের দিন সকালে নগেন অফিসে গিয়ে দেখল, তার ছোট সম্বন্ধী বিনু উল্টো দিকের চেয়ারে বসে আছে। নগেন একটু দেরিতে অফিসে আসে বিনুর বোধহয় জানা ছিল না। নগেনকে দেখে একমুখ বিরক্তি নিয়ে বিনু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। হাতে বই খাতা দেখে নগেন বুঝল বিনু কলেজে যাবার পথে এসেছে। নগেন বলল, 'কতক্ষণ এসেছ,

আমি একটু দেরিতেই আসি, বস বস।' বিনু কোনো রকমে চেয়ারে নিজেকে একটু ঠেকিয়ে রাখল মাত্র। জামাইবাবুর অনুরোধ ঠেলতে পারল না অথচ তার বোধহয় খুবই যাবার তাড়া আছে। বিনু বসতে বসতে বলল, 'দিদি যদি বলে দিত আমি প্রথম ক্লাসটা করে আসতুম।' নগেন মনে মনে একটু অসন্তুষ্ট হল। এতই যদি তাড়া তোমার, আসার কি দরকার ছিল! মল্লিকার উপর রেগেই ছিল, সেই রাগটাই আবার ঘুলিয়ে উঠল, তোমারই বা কি দরকার ছিল তোমার অনিচ্ছুক ভাইকে আদিখ্যেতা করে অফিসে পাঠাবার! নগেন অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে নিল। কিছু রূঢ় কথা মুখে এসেছিল, বলল না, শুধু বলল, 'তোমার দিদির ব্যাপার আমি জানি না, তোমাকে এখানে পাঠাবার কি দরকার ছিল?'

বিনু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'দিদির খুব জ্বর, আপনি সন্ধ্যের দিকে পারলে একবার যাবেন।'

'জ্বর? কবে থেকে?'

'যেদিন আমাদের ওখানে গেল সেদিন রাত থেকে। ডাক্তার বলছেন জ্বরটা সাধারণ নয়।' নগেন স্তব্ধ হয়ে কিছু সময় বসে রইল। নগেন কিছু বলছে না দেখে বিনু একসময় তার বই খাতা টেবিল থেকে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল। বিনু চলে যাবার অনেকটা পরে নগেনের খেয়াল হল, তার অনেক কিছু প্রশ্ন ছিল, অনেক কথা জানার ছিল, বিনুকে এক কাপ চা খাওয়ানো উচিত ছিল। নগেনের এই সব খেয়াল হতেই তাড়াতাড়ি উঠে লিফটের কাছে গেল। না, বিনু ততক্ষণে নেমে গেছে।

সন্ধ্যের সময় নগেন একটা ট্যাক্সি ধরে গড়িয়ার কাছে শ্বশুরবাড়িতে গেল। বাড়ি তখন প্রায় ফাঁকা। সকলেই তখন বাইরে। দরজার মুখে ছোট শালী ফুলির সঙ্গে দেখা হল। সেজেগুজে তাড়াতাড়ি কোথায় ছুটছিল। গানের ক্লাস-ট্লাসে। নগেনকে দেখে একটু থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'জামাইবাবু! বাব্বা, এত দিনে মনে পড়ল! যান ভেতরে যান, আমি এখুনি আসছি।' অন্য সময় হলে নগেন হয়ত একটু রসিকতা

করত। শ্বশুরবাড়িকে নগেন ভীষণ ভয় পায়। হুল্লোড়ে বাড়ি। অনেকটা মেসবাড়ির মতো। নিচের তলায় একঘর ভাড়াটে, তারা আবার অবাঙালী। কর্তার বড়বাজারে কাপড়ের দোকান। ভদ্রলোকের স্ত্রীটি মোটাসোটা গায়ে-গতরে। সব সময় পান-জর্দায় পুরুপুরু ঠোঁট দুটি লাল। ভদ্রমহিলার সারাদিন কোনো কাজ নেই। তারস্বরে রেডিও খুলে বসে থাকেন। সারা বাড়ি অষ্টপ্রহর হিন্দী গানে গমগম করছে। উপরের তলায় শ্বশুরমশাইদের পরিবারেও যেন এই পরিবেশের ছোঁয়া লেগেছে। উঁচু গলায় কথা, উঁচু হাসি, যখন-তখন মেয়েদের বাইরে যাওয়া কিংবা চব্বিশ ঘণ্টা বাইরের ছেলেদের বাড়িতে আড্ডা নগেন অপছন্দ করে। সেই কারণে মল্লিকা মাঝে মাঝে এলেও নগেন পারতপক্ষে আসতে চায় না।

ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে উপরে উঠতে উঠতে নগেন একটু আশ্চর্য হল। নিচে রেডিও বাজছে না, উপরে হৈ-হৈ হচ্ছে না। হল কি! সিঁড়িতে একটা মৃদু আলো জ্বলছে। এ বাড়ির সিঁড়ির বাল্বটা প্রায়ই চুরি হয়ে যায়। নগেন ভেবেছিল মল্লিকার ঘরে সেই মহাচ্যাংড়া বিশুটাকে দেখবে যাকে দেখলে তার পা থেকে মাথা অবধি জ্বলতে থাকে। অথচ এ বাড়ির সকলে বিশু বলতে অজ্ঞান।

দোতলার বারান্দায় নগেন কাউকে দেখতে পেল না। সারা বাড়িতে যেন হাসপাতালের নিস্তব্ধতা। এমন তো কখনো হয় না। বারান্দার একেবারে দক্ষিণমুখো শেষ ঘর থেকে একটা আলোর রেখা বাইরে লুটিয়ে পড়েছে। দরজার পর্দাটা মাঝে মাঝে হাওয়ায় উড়ছে। নগেন সেই আলো লক্ষ্য করে এগিয়ে গেল। ঘরের সামনে এসে মনে হল ভেতরে কেউ আছে। নগেন একটুক্ষণ ইতস্তত করে পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকলো। মল্লিকাই শুয়ে ছিল, মাথার কাছে সারদা বসে কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। সারদা এ বাড়ির অনেক দিনের রাঁধুনী। নগেনকে ঘরে দেখে সারদা মাথায় কাপড় দিয়ে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। নগেন জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছে?' সারদা দরজার পাশে জড়সড় হয়ে বলল, 'জ্বরটা এই সন্ধ্যের দিকেই বাড়ে, আজও বেড়েছে।' মল্লিকা আচ্ছন্নের

মতো পড়ে ছিল, নগেনের গলা পেয়ে কোনো রকমে চোখ মেলে তাকাল, হাতের ইশারায় নগেনকে বিছানার পাশে এসে বসতে বলল। সারদা ততক্ষণ বেরিয়ে গেছে।

ঘরে একটা মৃদু আলো জ্বলছিল। ঘরের সমস্ত জানলা হাট খোলা। এ দিকটা বেশ খোলামেলা, হাওয়া থাকলে উড়িয়ে নিয়ে যায়। মল্লিকা একটা চেক চেক ফিকে নীল রঙের শাড়ি পরে শুয়েছিল। মাথার চুল এলো করে রেখেছে। বালিশ ঝাঁপিয়ে খাটের পাশে লুটিয়ে পড়েছে। মল্লিকার চুল আর চোখ ছিল দেখার মতো। মল্লিকার এই অসহায় করুণ অবস্থা দেখে নগেনের চোখে তখন জল এসে গেছে। মল্লিকার একটা হাত নিজের মুঠোয় নিয়ে নগেন ধরা গলায় মল্লিকা বলে ডাকল। মল্লিকা উত্তরে তার হাত দিয়ে নগেনের চুল, মুখ, চিবুক স্পর্শ করল, তারপর খুব আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল, 'কখন এলে ? আর একটু কাছে সরে এস।' নগেন মল্লিকার খুব কাছে সরে গিয়ে বলল, 'এই তো, এই মাত্র এলাম।'

'সোজা অফিস থেকে।'

'হ্যাঁ, সোজা।'

'ব্যাস্ তুমি এসে গেছো, আমার ভাবনা কি! দাঁড়াও, চায়ের ব্যবস্থা করি।'

নগেন মল্লিকাকে চেপে শুইয়ে দিল, 'পাগল না কি! তুমি কোথায় যাবে! চা যখন হবার তখন ঠিকই হবে।' জ্বরে মল্লিকার গা পুড়ে যাচ্ছে। ফর্সা কপালের ওপর রুক্ষ চুলের কয়েকটা গুছি ঝুলে এসেছে। রগের পাশে নীল শিরা উঠেছে। মল্লিকার চোখ দুটো এমনিই সাগরের মতো নীল। জ্বরের তাপে চোখ দুটো ছলছলে। নগেনের ইচ্ছে করছিল মল্লিকার মার কথা জিজ্ঞেস করে, কিন্তু করল না। নগেন না জিজ্ঞেস করেও জানে মল্লিকার মা কোথায়? ভদ্রমহিলা সারা জীবন শুধু সিনেমা, থিয়েটার, যাত্রা, বেড়ানো, এ-সভা ও-সভা নিয়েই রইলেন। ছেলে-মেয়েদের ঝক্কি কোনো দিনই সামলাতে হয়নি। স্বামীর প্রতি কি কর্তব্য করেছেন তা তাঁর স্বর্গত স্বামীই জানেন। মল্লিকা তার মাথা নগেনের

কোলে রাখল।

তার পরের দিনই নগেন মল্লিকাকে বাড়ি নিয়ে এল। নগেন জানত শ্বশুরবাড়িতে মল্লিকার চিকিৎসা হবে না। আর সেই যে মল্লিকার শরীর ভাঙল, সে শরীর আর পুরোপুরি শোধরালো না। নগেনের সঙ্গে মল্লিকার বয়সের পার্থক্য দশ-বারো বছরের বেশি ছিল না, কিন্তু মল্লিকা স্বভাবে এত ছেলেমানুষ ছিল আর নগেন এত সংবেদনশীল ছিল, নগেনের মাঝে মাঝে মনে হত মল্লিকা তার স্ত্রী নয়, মেয়ে। মল্লিকার অসুখের সময় নগেন কতদিন মাঝরাতে ছাদে গিয়ে পায়চারি করতে করতে চোখের জল ফেলেছে। তারা-ভরা অনন্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করতে চেয়েছে, মল্লিকার জন্য প্রার্থনা করেছে। মনে মনে বলেছে, মল্লিকার সমস্ত অসুখ তার শরীরে চলে আসুক।

নগেনের প্রার্থনা ঈশ্বর শুনেছিলেন কিনা জানা নেই। তবে মল্লিকা অসুস্থ শরীরের সঙ্গে অনেক দিন যুঝেছিল। ডাক্তার বলেছিলেন, কিড্‌নীর অসুখ সহজে সারে না। তবে আজকাল বহুরকমের অ্যান্টি-বায়োটিক্‌স্ বেরিয়েছে। রোগের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করা একেবারে দুঃসাধ্য কিছু নয়। মল্লিকার বেঁচে থাকার প্রচণ্ড ইচ্ছে ছিল, বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে সংসার করার সখ ছিল। ইচ্ছে ছিল, মেয়ের পর একটা ছেলে হোক। নগেনের ক্ষমতায় যা ছিল তাই দিয়ে সে মল্লিকার জীবনের সাধ মেটাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে, কিন্তু ঈশ্বরের হাতে যা ছিল তার উপর নগেন কিংবা মল্লিকার কোনো হাত ছিল না।

শেষটায় মল্লিকা বুঝতে পেরেছিল প্রদীপে তেল ফুরিয়ে আসছে। কোথাও যাবার আগে মানুষ যেমন অনেক কাজ সেরে যেতে চায় মল্লিকাও তেমনি সব সেরে যেতে চেয়েছিল। কেমন একটা ছেলে-মানুষী। এ যেন কয়েক দিনের জন্যে চেঞ্জে যাওয়া, মাসখানেক পরে আবার ফিরে আসা। নগেনকে দিয়ে বাজার থেকে কাপড় আনিয়ে উল্কার একগাদা জামা করেছিল। যেখানে যত জামা ছিল, সমস্ত জামার টিপকল বোতাম লাগিয়েছিল। বাড়তি এক সেট্ করে দরজা জানলার

পর্দা. সোফার ঢাকা তৈরি করেছিল। সমস্ত উলের জামা কাপড় কেচে রোদে দিয়ে পরিষ্কার করে রেখেছিল। যেখানে যত ছেঁড়া ফুটো ছিল সব সেলাই কিংবা রিপু করেছিল। নগেন এবং উল্কার জন্যে বয়েম বয়েম আচার তৈরি করেছিল। রান্নাঘরে যেখানে যত কৌটো, জার ছিল সব ঝকঝকে পরিষ্কার করে সাজিয়ে সাজিয়ে রেখেছিল। নগেন সারাদিন অফিসে থাকত আর সেই সময় মল্লিকা একলা বাড়িতে এই সব করে বেড়াতো। শেষ উল্কার জন্যে নতুন ডিজাইনের একটা সোয়েটার বুনছিল সেটা আর শেষ করতে পারেনি। প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল, আর কয়েকটা দিন সময় পেলে কাঁটা থেকে নেমে যেত। এখনও সেই সোয়েটারটা কাঁটা জড়ানো অবস্থায় প্ল্যাস্টিকের খাপে পড়ে আছে।

মল্লিকা মৃত্যুর পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছিল ঠিকই, কেবল তার গতিটা বুঝতে পারেনি। নগেনও না। একটানা সাতদিন বর্ষার পর রোদ উঠতে দেখে নগেন একটু খুশি হয়েছিল। মল্লিকার জ্বরটাও হঠাৎ ছেড়ে গেল। দুপুরে মল্লিকা একটু স্যুপ খেল, কয়েক কুচি ফল। বেশ খিদে ছিল সেদিন, হাসি হাসি মুখ করে ছেলেমানুষের মতো বলেছিল, 'আর কিছু পাব না!' নগেন একটা বড় ভাল সন্দেশ দিয়েছিল। মিষ্টি কম। মল্লিকা খুশি খুশি মুখ করে খেয়েছিল। দুপুরটা বেশ ভালই কাটছিল। মল্লিকা এই সময়ে একটু গান শুনতে চাইল। তার সেই প্রিয় দুটি রবীন্দ্র সংগীত। 'যেতে যেতে একলা পথে', আর 'এই কথাটি মনে রেখো'। পশ্চিমের জানলা দিয়ে বাগানের গাছের পাতার ফাঁক খুঁজে এক চিলতে রোদ মল্লিকার পায়ে এসে পড়েছিল। পায়ের গোড়ালিতে বাসি আলতার ছোপ। মল্লিকার পা দুটো ছিল ভারি সুন্দর। পাতলা পাতলা, লাল টুকটুকে। গোড়ালি দুটো ছিল মসৃণ যেন মোম-ঘষা। অসুখে ভুগে ভুগে পা দুটো ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল। সারা চেহারায় একটা অসুস্থ হলদে ছোপ পড়েছিল। রোদটা পায়ের পাতা থেকে ক্রমশ শাড়ি বেয়ে হাঁটুর দিকে উঠে আসছিল। তার মানে সূর্য একটু একটু করে পশ্চিমের আকাশে গড়িয়ে পড়ছিল। মল্লিকা সেদিন একটা সুন্দর

হলদে শাড়ি পরেছিল। নগেন বুঝতে পারছিল মল্লিকার আবার জ্বর আসবে। হাতের চেটো, পায়ের পাতা বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল।

মল্লিকার চুলে হাত বোলাতে বোলাতে নগেন বলছিল, পুজোর পর শীতের মুখটায় মল্লিকা একটু সুস্থ হলেই নগেনরা মধুপুরে গিয়ে, বিয়ের পর তারা যে বাড়িটায় উঠেছিল সেই বাড়িটাতেই উঠবে। সেই নরেন্দ্র ঘটক রোড ধরে তখন যেমন দুজনে হাঁটতে হাঁটতে সেই উঁচু জায়গাটায় চলে যেত যেখানে বিশাল বিশাল থামগুলা গোটাকতক বাড়ির ভগ্নাবশেষ পড়ে আছে, ঠিক সেই জায়গাটায় তারা তিনজনে যাবে। বাড়িগুলোর যে কটা থাম দাঁড়িয়ে ছিল এই কয়েক বছরে সবই হয়ত শুয়ে পড়েছে। জায়গাটাকে মনে হয় যেন রোম। কোনো কালে কত মানুষের কোলাহলে এই সব বাড়ি হয়ত সরগরম থাকত। আজ তারা কোথায়! নগেন মল্লিকাকে জিজ্ঞেস করছিল তার সেই সাঁকোটার কথা মনে পড়ে কি না, যার তলা দিয়ে কুল কুল করে জল বয়ে যেত, ঝাঁক ঝাঁক টিয়া পাখি উড়ত কিংবা তাদের বাড়ির বাগানের সেই বেদীটা যার চার দিকে গন্ধরাজ গাছ ফুলে ফুলে সাদা হয়ে থাকত। কথা বলতে বলতে নগেনের মনে হচ্ছিল বারোটা বছর যেন এই সেদিনের কথা। জীবন যেন বড় দ্রুত ফুরিয়ে গেল। বেশ যখন জমিয়ে জাঁকিয়ে বসতে গেল তখনই দেখল আসর ভেঙে আসছে, সব কটা প্রদীপ তেলের অভাবে নিবু নিবু।

কথা বলতে বলতে নগেনের মনে হল, একাই বকে যাচ্ছে। মল্লিকা কিছুই বলছে না, যেন বড্ড বেশি স্থির, শরীরটা যেন বড় বেশি এলিয়ে দিয়েছে। আর ঠিক তখনই নগেন আবিষ্কার করল মল্লিকা নেই, মল্লিকা কখন নিঃশব্দে চলে গেছে। চোখ দিয়ে একটু জল গড়িয়ে গাল বেয়ে নেমে গেছে। হয়ত কিছু বলতে চেয়েছিল, হয়ত তখন সে মধুপুরে নগেনের সঙ্গে ঘুরছিল এমন সময় একটা কষ্ট একটা কিছু দলা পাকিয়ে গলার কাছে উঠে এল, মল্লিকা হয়ত একটু জল চাইত কিন্তু সে কিছুই করতে পারল না। নগেনের হাতে এইভাবে একটা পোষা ময়না মারা গিয়েছিল। অনেক কাল আগে। ছেলেবেলায়।

২

ওয়ার্ডে ঢুকে নগেন দেখল, দূরে কোণের বেডে উল্কা শুয়ে আছে। মাথার নিচে কোনো বালিশ নেই। অনেকটা শবের মতো দুপাশে হাত রেখে চিত হয়ে উল্কা শুয়ে আছে। ঠিক এইভাবে একভাবে তাকে তিন মাস শুয়ে থাকতে হবে। তিন মাসের মাত্র কয়েকটা দিন পার করতে পেরেছে। উল্কা কি ঘুমিয়েছে! না, এই বিকেলে সে ঘুমোবে না, চোখ বুজে চুপটি করে শুয়ে আছে।

নগেন আপেলের ঠোঙাটা বেডের পাশের অ্যালুমিনিয়াম-মোড়া মিটসেফের উপর রেখে আস্তে ডাকল, 'উল্কা।' উল্কা চোখ মেলে তাকাল। করুণ একটু হাসল। নগেন খুব সাবধানে শব্দ না করে একটা টুল টেনে নিয়ে বিছানার ধারে বসল। একটা হাত আলতো করে উল্কার কপালে রাখল। ভিজে ভিজে দু-একটা চুল কপালে জড়িয়ে আছে। না, জ্বর নেই। নগেন চোখ তুলে সিলিংয়ের দিকে তাকাল। একটা পাখা খুব ধীরে ঘুরছে অনেক উঁচুতে। উল্কার মুখের কাছে ঝুঁকে নগেন ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছ?'

'ভাল। তুমি কেমন আছ?'

'আমি! আমি ভাল আছি মা।'

'ঠিক সময়ে খাওয়া-দাওয়া করছ তো?'

উল্কার কথায় নগেন চমকে উঠল। এ যেন মল্লিকার গলা! মেয়ে অনেকটা মার মতো দেখতে হয়েছে। মেয়েরা মায়ের মতো দেখতে হলে না কি দুঃখ পায়!

নগেন মেয়ের মাথায় হাত রাখল, 'তোমার এখানে কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো ? যে লোক তোমার দেখাশোনার জন্যে রেখেছি সে ঠিক মতো দেখছে তো !' নগেন এ ছাড়া আর কোনো কথা খুঁজে পেল না। উল্কা ঘাড় না ফিরিয়ে বাবার দিকে চোখ ফেরাল। চোখ দুটো বড় করুণ, বড় অসহায়। উল্কা একটু হাসল, 'আমার ভীষণ কষ্ট হয়। এইভাবে চিত হয়ে শুয়ে থাকা। এখানে তো সবই সময়ে বাঁধা। সময় পেরিয়ে গেলে সব কিছুই হাতের বাইরে।'

মেয়ের কথায় নগেন খুব অবাক হল। এইটুকু মেয়েই কেমন গম্ভীর। সময়ের কথাটা নগেনের কাছে খুব অর্থবহ মনে হল। সময়ের বাইরে একটা কিছু চলে গেলে হাত বাড়িয়ে তার আর নাগাল পাওয়া যাবে না। নদীর প্রখর স্রোতে কুটোর মতো ভেসে যাবে। প্রতি মুহূর্তে বর্তমান টুকরো টুকরো হয়ে অতীতে চলে যাচ্ছে। নগেন জোর করে দার্শনিক চিন্তা থেকে তার মনকে সরিয়ে নিয়ে এল।

'তোমার জন্যে আপেল এনেছি। বিস্কুট তাড়াতাড়িতে কিনতে পারিনি। চকোলেট ডাক্তারবাবু তোমাকে খেতে বারণ করেছেন।'

উল্কা খুব উদাসভাবে বলল, 'তাতে কি হয়েছে! এমনিই আমার খুব একটা খাবার ইচ্ছে নেই।' উল্কা যেন কেমন উদাস হয়ে পড়েছে। জীবন সম্পর্কে তার যেন কোনো উৎসাহই নেই। কত দূর থেকে যেন তার কথা ভেসে আসছে, হাওয়ায় ভেসে আসা বৃষ্টির গুঁড়ির মতো। বয়সের তুলনায় উল্কাকে যেন বেশি বয়স্ক মনে হয়। দুর্ঘটনাটার পর সে যেন অত্যন্ত অন্তর্মুখী হয়ে গেছে।

হাতে একটা চার্ট নিয়ে সিস্টার ঘরে এলেন। উল্কার জ্বর দেখবেন। ওষুধ খাওয়াবেন। সিস্টারের সৌম্য চেহারার মধ্যে নগেন উল্কার মাকে খুঁজলেন। ভদ্রমহিলা মেয়েটাকে যদি দেখেন, একটু যত্ন করেন! হাসপাতালের নিয়ম অনুসারে একটু পরেই নগেনকে চলে যেতে হবে। আস্তে আস্তে নদীর জলের মতো রাত বাড়বে। সমস্ত ওয়ার্ড নিঝুম হয়ে

আসবে। চড়া আলোগুলো একে একে সব নিভে যাবে। হাওয়ায় ভাসবে ইথার আর ডিসইনফেকটাণ্টের গন্ধ। তখন উল্কা সম্পূর্ণ একা। দু হাতের দুটো চেটোই তার উরুর মাংসের মধ্যে ঢুকিয়ে সেলাই করে দেওয়া হয়েছে। প্ল্যাস্টিক সার্জারির এই নাকি রীতি। ভাবলে খুবই ভয়াবহ মনে হয়, খুবই নৃশংস, যন্ত্রণাদায়ক। সিস্টার উল্কার জ্বর দেখতে দেখতে নগেনকে বললেন, 'আপনার মেয়ে কিন্তু কিছুই খেতে চায় না। এই রকম করলে ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়বে। আপনি ওকে খাবার কথা বলে যান।'

'জ্বর আছে?'

'খুব সামান্য।' সিস্টার চার্টে সময়ের খোপে জ্বর লিখে চার্টটা উল্কার মাথার কাছে ঝুলিয়ে রাখলেন। নগেন এতক্ষণ সিস্টারের দিকে তাকিয়ে ছিল। সিস্টার আপেলের ঠোঙাটা মিটসেফের উপর থেকে সরিয়ে রাখতে রাখতে নগেনকে বললেন, 'একটা চিরুনি কিনে আনবেন। উল্কার চিরুনিটা কাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। চুলে জট পাকিয়ে গেছে, আঁচড়ে দিতে হবে। একটা মেডিকেটেড শ্যাম্পু আনতে পারলে ভাল হয়।'

নগেনের মনে পড়ল মল্লিকার একটা রুপো-বাঁধানো চিরুনি ড্রেসিং টেবিলের উপর হেয়ারব্রাশে লাগানো আছে। মল্লিকার চুল ছিল অদ্ভুত। চুল খুলে দিলে ঢেউয়ের মতো কোমর ছাড়িয়ে ভেঙে পড়ত। সেই চুলই সৎকারের সময় কি রকম ফুর ফুর করে জ্বলে গেল সবার আগে। উল্কার এখনই এক মাথা চুল। নগেন বলল, 'আমি টাকা দিয়ে গেলে আপনি কিনে আনাবেন?' সিস্টার বললেন, 'কোন আপত্তি নেই।' নগেনের মনে হল সবই যেন সেদিনের কথা, জানলার ধারে বসে মল্লিকা উল্কার চুল আঁচড়ে বিনুনি করে দিচ্ছে। নগেন একটু দূরে বসে একটা বই কি ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছে কিংবা চা খাচ্ছে। সেইসব মুহূর্ত সময়ের স্রোতে ভেসে গেছে, আর ধরা যাবে না কিছুতেই।

'তুমি খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছ কেন উল্কা?'

'আমার যে একদম খিদে পায় না বাবা। সারাদিন শুয়ে থাকলে

তোমারও ওই রকম হত।'

'তা হলেও কিছু তো খেতে হবে, তা না হলে দুর্বল হয়ে পড়বে। তোমার কি খেতে ভাল লাগে বল, আমি কিনে আনব।'

উল্কা চোখ না খুলেই বলল, 'আমি নিজে হাতে খেতে পারি না, আমাকে খাইয়ে দেয়, আমার ভীষণ ঘেন্না করে।'

নগেন এইটা এতক্ষণ ভেবে দেখেনি, সত্যিই তো, উল্কা নিজের হাতে খেতে পারে না। একমাত্র মা খাইয়ে দিলে খাওয়া যায়, অন্য কেউ খাইয়ে দিলে অস্বস্তি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। নগেন বুঝল, বিস্কুট না এনে সে খুব ভুল করেছে। শুক্‌নো বিস্কুট মুখের কাছে ধরলে তবু খাওয়া যায়। চিরুনি আর শ্যাম্পু কেনার টাকা দেবার সময় সে সিস্টারকে বিস্কুটের টাকাও দিয়ে যাবে। কাছাকাছি বাজারে ভাল বিস্কুট অবশ্যই পাওয়া যাবে।

দুর্ঘটনাটার পর থেকে নগেন যখনই উল্কার মুখোমুখি হয় তখনই সে দেখেছে তার মনের ভিতর একটা অপরাধবোধ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। নগেন কি রকম আড়ষ্ট হয়ে যায়। কথা ফুরিয়ে আসে। কতদিন সে মনকে বুঝিয়েছে, নিয়তি বলে একটা জিনিস আছে। যখন যা ঘটার তা ঘটবেই। কেউ আটকাতে পারবে না। কিন্তু মন কিছুতেই বুঝতে চায় না। সে যদি চায়ের জলের কেটলিটা তুলে নেবার পর হিটারটা নেভাতে ভুলে না যেত তাহলে সেই গনগনে হিটারে উল্কা অন্যমনস্ক হাত দিতে পারত না। লাল লাল পাকানো কয়েলে উল্কার ওই নরম কচি কচি হাত ওভাবে দগ্ধ হত না।

দৃশ্যটা নগেন এখনও চোখ বুজলে দেখতে পায়। সেদিন রবিবার। দুপুরে দুজনে একসঙ্গে স্নান করেছে, ভাত খেয়েছে। বিছানায়, ঘর অন্ধকার করে, পাখার তলায় দুজনে খানিক গড়িয়েছে। নগেন ঘুমোতে পারেনি, এপাশ ওপাশ করে উঠে পড়েছে। উল্কা কিন্তু ঘুমিয়ে পড়েছিল।

মল্লিকা থাকতেই নগেন অনেক কাজ নিজেই করে নিত। ছেলে-

বেলায় রামকৃষ্ণ মিশনে লেখাপড়া করার ফলে এবং প্রথম বয়সেই মা মারা গিয়েছিলেন বলে নগেনের নিজের কাজ নিজে করা শিক্ষা হয়েছিল। মল্লিকা চলে যাবার পর তো কোনো কথাই ছিল না। রান্না ছাড়া টুকিটাকি সব কাজই তাকে করতে হত। তা ছাড়া কাজের মধ্যে থাকলে মল্লিকার কথা ভুলে থাকা যেত। রান্না করার জন্যে রাঁধুনী ছিল, কিন্তু মল্লিকার কাজগুলো কে করবে! সংসার যত ছোটই হোক, কাজের শেষ নেই। উল্কার দেখাশোনাও একটা বড় কাজ। তার স্নান, খাওয়া, জামা ছাড়ানো, পরানো, বিছানা করে দেওয়া, জলখাবারের ব্যবস্থা করা, বেড়াতে নিয়ে যাওয়া, গল্প করা, খেলা করা। মল্লিকা একটা ভাল কাজ দিয়ে গেছে, যে কাজে চব্বিশ ঘণ্টাই ব্যস্ত থাকা যায়। উল্কাকে ঘিরেই এখন নগেনের যত স্বপ্ন! ভবিষ্যত মানেই উল্কা!

সিঁড়ির তলায় লম্বা একটা টেবিলের উপর ছিল পাওয়ার প্লাগ। সেই পাওয়ার প্লাগের সঙ্গে জোড়া ছিল বড় একটা হিটার। লম্বা টেবিলটা সময় সময় রান্নার টেবিল হিসেবে ব্যবহার করা হত। চায়ের ব্যাপারটা মল্লিকার সময় থেকেই এই টেবিলেই হত। নগেন কেটলিতে জল চাপিয়ে ছিল। জল ফুটে যাবার পর নগেন কেটলিটা নামিয়ে নিয়ে রান্নাঘরে চলে গিয়েছিল। যাবার আগে অন্যান্য দিন সে হিটারটা নিভিয়েই দিয়ে যেত। এই ব্যাপারে, সে সব সময় খুব সাবধান। কিন্তু সেদিন না নেভাবার দুটো কারণ ছিল, প্রথমত উল্কাকে সে ঘুমোতে দেখেছে, দ্বিতীয়ত উল্কার দুধটা সে তখনই বসাতে আসছিল, এমন সময় দুর্ঘটনাটা ঘটে গেল। উল্কা সময়ের সেই ভগ্নাংশে ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই কেন যে হিটারের দিকে গেল নগেন এখনও বুঝতে পারে না। কেটলিতে চামচে মেপে চা ভিজিয়ে, দুধের প্যানটা হাতে নিয়েছে কি নেয়নি, এমন সময় মর্মান্তিক চিৎকার। নগেন প্রথমে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। তীরবেগে টেবিলের দিকে দৌড়ে গিয়ে দেখল, উল্কা মেঝেতে পড়ে আছে, কচি হাত দুটো পুড়ে ঝলসে গেছে। শকও বোধহয় খেয়েছিল, কারণ হিটারটা শর্টসার্কিট হয়ে পুরো লাইনটা ফিউজ হয়ে

গিয়েছিল। পাকানো পাকানো লাল কয়েলের আকর্ষণে, না হিটারের উপরের সুইচটা অফ করতে গিয়ে, কি কারণে যে উল্কা দু হাত দিয়ে হিটারটা ছুঁয়েছিল তা আজও অজ্ঞাত।

ঠিক এই রকম একটা ভয়াবহ দুর্ঘটনার জন্যে নগেন প্রস্তুত ছিল না। লাইনটা উল্কার স্পর্শে ফিউজ না হলে, উল্কা হয়ত মারাই যেত! পড়ে রইল দুধ, পড়ে রইল খোলা ঘর-দোর, নগেন মেয়েকে কোলে নিয়ে প্রথমেই দৌড়ল ডাক্তারখানায়। তখন আর ডাক্তার কোথায়! উল্কার ঝলসানো হাতের দিকে তাকিয়ে কম্পাউণ্ডার বললেন, এখনই হাসপাতালে নিয়ে যান। স্থানীয় হাসপাতালের সাধ্যে যা ছিল তাঁরা তা করলেন। বোতল খানেক রক্ত দিতে হল। উল্কা বেশ বড় ধরনের শক খেয়েছিল। রক্তের লোহিত কণিকা সব জল হয়ে গিয়েছিল। স্থানীয় হাসপাতালে মাসখানেক থাকার পর হাতের ঘা একটু সুস্থ হল, উল্কার শরীরেও কিছু বল এল। ডাক্তারবাবু বললেন, বিকৃত হাত প্ল্যাস্টিক সার্জারির মাধ্যমে স্বাভাবিক অবস্থায় আনা যেতে পারে।

৩

নগেন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল বড় জোর আর মিনিট পনের সে উল্কার কাছে বসতে পারবে। তারপর হাসপাতালের নিয়ম অনুসারে ওয়ার্ড ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হবে। সূর্য ইতিমধ্যে দিগন্তের তলায় পৃথিবীর ওপিঠের দেশে ভোরের আকাশে আলো দেবার জন্যে ঢলে পড়েছে। রেস কোর্সের উপর থিকথিক করে অন্ধকার জমছে। বাইরে একটা ঝাঁকড়া গাছের উপর অজস্র পাখি দিনান্তের গান গাইছে। নগেন যেন নতুন কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছে না। উল্কার কপালে হাত রেখে আস্তে আস্তে বলল, 'ডাক্তারবাবু বলেছেন তোমার হাত আবার আগের মতো সুন্দর হয়ে যাবে। আর তো মাত্র কয়েক দিনের কষ্ট, এর পর তুমি ছাড়া পেয়ে যাবে।' উল্কা চোখ না খুলেই বলল, 'বাবা, আমার সেই ঝাউ গাছটা বেঁচে আছে?' নগেনের ঝাউ গাছটার কথা কিন্তু তখনই মনে পড়ল। দুজনে রথের মেলা থেকে গাছটা কিনে এনে বাগানের পূর্ব-দিকে বসিয়েছিল। উল্কার খুব সখের গাছ। তার কোনো বন্ধুর বাড়িতে এই গাছ দেখে খুব ভাল লেগেছিল। উল্কা নিজের হাতে রোজ বিকেলে রোদ পড়লে গাছটার গোড়ায় জল ঢালত। নগেন অনেক দিন গাছটা দেখেনি, জলও দেয়নি। বেঁচে আছে কি মরে গেছে তাও বলতে পারবে না। নগেন একটুক্ষণ চুপ করে থেকে মিথ্যে কথাই বোধ হয় বলল, 'তোমার গাছ ভাল আছে মা।' উল্কা মিথ্যেটা বুঝতে পারল কিনা নগেন জানে না। উল্কা একটু হেসে জিজ্ঞেস করল, 'আমার মুনিয়া পাখিরা?' একটা বড় খাঁচায় ছিল। নগেন রোজ সকালে কাঁকড়ি দানা দেয়। একটা

পাখি যে সেদিন মরে গেছে সে কথা উল্কাকে না বলাই ভাল বোধ হয়। নগেন একটু উচ্ছ্বাসের ভাব করে বলল, 'ওঃ ফার্স্ট ক্লাশ আছে। সবকটাই খুব চিয়ারফুল। কেবল মাঝে মাঝে একটা ছুটো পাখি তোমাকে খুব খোঁজে।'

'তুমি ওদের রোজ খেতে দাও?'

'বাঃ, দেবো না, তুমি যে ওদের ভার আমার ওপর দিয়েছ।'

নগেনের যেন নিজেকে উপহাস করতে ইচ্ছে করল। মল্লিকাও তো উল্কার ভার নগেনকে দিয়ে গিয়েছিল। নগেন সে দায়িত্ব কি সুন্দর পালন করেছে! উল্কা আজ তারই সামনে হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছে। উল্কার তো এই মুহূর্তে কলকণ্ঠে খেলার মাঠ থেকে বাড়ি ফেরার কথা! উল্কার তো একটু পরেই পড়তে বসার কথা। নগেনের সান্ধ্য গৃহকোণ উল্কার উচ্ছ্বাসে, হাসিতে, অস্থিরতায় ভরপুর থাকার কথা! নগেন তার দায়িত্ব কি সুন্দর পালন করেছে!

নগেন বলল, 'এইবার তাহলে আমি উঠি মা?' নগেন আস্তে আস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠল। উল্কা সেই একই ভাবে শুয়ে থেকে বলল, 'আমি তাহলে কবে ফিরবো বাবা?' নগেন মেয়ের কপালে খুব সাবধানে একটা চুমু খেয়ে বলল, 'আমি আজ যাবার সময় ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞেস করব।' নগেন ধীরে ধীরে ওয়ার্ড ছেড়ে বেরিয়ে এল। দীর্ঘ করিডর এপাশ থেকে ওপাশে চলে গেছে। সিস্টার কোথায়? অনেক দূরে করিডরের শেষে, সোজা আলোর তলায় সাদা শাড়ি পরা ছুজন মহিলা দাঁড়িয়ে। মাথায় হেলানো সাদা কাপড়ের টুপি। নগেন এগোচ্ছে সোজা লম্বা পা ফেলে। জীবন থেকে জীবনে সে হেঁটে চলেছে একে একে দরজা খুলে আর বন্ধ করে। মল্লিকার জীবন থেকে বেরিয়ে এসে উল্কার জীবনের পাশ দিয়ে পথ করে সে কোথায় চলেছে তা একমাত্র চলার দেবতাই জানেন।

হ্যাঁ, নগেন ঠিকই ভেবেছে। ছুজন মহিলার একজন সেই সিস্টার যাঁকে চিরুনি আর শ্যাম্পুর জন্যে টাকা দিতে হবে। নগেন প্রথম থেকেই

দেখছে, এই ভদ্রমহিলা তার সঙ্গে অত্যন্ত ভাল ব্যবহার করেন। নগেনের মনে পড়ল অনেক দিন আগে তার একজন পরিচিত জ্যোতিষী কোষ্ঠী দেখে বলেছিলেন, 'সে নাকি প্রমদাকুল হইতে সুখী হইবে।' তার মানে মেয়েরা তাকে পছন্দ করবে। কেন করবে তা সে জানে না তবে একথা ঠিক, কোনো মহিলা কখনও তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেননি। মল্লিকাই কি তাকে কম দিয়েছে! তার জীবনের, চরিত্রের শ্রেষ্ঠ সম্পদ একে একে এক একটি অলঙ্কারের মতো তাকে খুলে খুলে দিয়েছে। তারপর সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে, রিক্ত হয়ে তার আকাশে মৃত নক্ষত্রের মতো অস্ত গেছে।

সিস্টার হাত পেতে টাকা নিতে নিতে বললেন, 'আপনাকে সব সময় এত বিষণ্ণ দেখি কেন? অত ভাববার কি আছে? মেয়ে আপনার মাসখানেকের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে। ভারি মিষ্টি মেয়েটি।' নগেন একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'আমি কি একটু আর. এম. এস-এর সঙ্গে দেখা করব?'

'কেন?'

'একটু জিজ্ঞেস করতুম উল্কা কেমন এগোচ্ছে, হাত দুটো ঠিক হবে কিনা!'

'আর. এম. এস-কে জিজ্ঞেস করতে হবে না, আমিই বলছি, উল্কা ভাল প্রগ্রেস করছে, সব ঠিক হয়ে যাবে। বরং চলুন আপনাকে একটু চা খাওয়াই।'

'চা! চা এখানে পাবেন কোথায়?'

'সব আছে, সব আছে। হাসপাতালই আমাদের সংসার। এখানে কি নেই।'

নগেন একটুক্ষণ চুপ করে রইল, একটু যেন ইতস্তত, অনেকক্ষণ জল-তেষ্টা পেয়েছে, এক কাপ চা, নিতান্ত মন্দ প্রস্তাব নয়। নগেন এক ধরনের উদ্ভাসিত হাসি হেসে, অনেকটা আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে বলল, 'চলুন।' নগেন সিস্টারের পিছন পিছন একটা ছোট অফিস-ঘরে প্রবেশ করল। ঘরে একটা ছোট টেবিলের চারপাশে কয়েকটা

চেয়ার। টেবিলের উপরটা কাঁচ দিয়ে ঢাকা। কয়েকটা ওষুধের শিশি, একটা এনামেল ট্রের উপর ইঞ্জেকসানের এমপুল্স্, হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ। ঘরের আর এক পাশে একটা লম্বা টেবিল, টেবিলে একটা গ্যাসবার্ণার, কয়েকটা ল্যাবরেটারি ইকুইপমেণ্ট। সিস্টার একটা চেয়ার টেনে নিয়ে নগেনকে বসতে বললেন। নগেন মৃদু হেসে বসল। এতক্ষণ নগেন যে শক্তি নিয়ে ঘুরছিল, সেই শক্তি যেন হাওয়ার মতো বেরিয়ে গেছে। একটা চোপসানো বেলুনের মতো হাত পা ছেড়ে চেয়ারে বসল।

কোণের লম্বা টেবিলে গ্যাসবার্ণার সোঁ সোঁ শব্দ করছে। চায়ের জলও বোধহয় প্রায় ফুটে এল। নগেনের সামনে একটা বিশাল খোলা জানলা তারের জাল দিয়ে ঘেরা। বাইরে রাতের আকাশে শহরের আলো পড়েছে। মাঝে মাঝে ট্রামের আওয়াজ কানে ভেসে আসছে। কাপের গায়ে চামচের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। নগেন না তাকিয়েও বুঝতে পারছে সিস্টার চা তৈরিতে ভীষণ ব্যস্ত। মেয়েদের কাজ করবার একটা নিজস্ব ভঙ্গী আছে। কাজে ব্যস্ত মেয়েদের দেখতে নগেনের ভীষণ ভাল লাগে। নগেন কত ছুটির দিনে বাড়িতে বসে মল্লিকার কাজ মুগ্ধ হয়ে দেখেছে। মাথায় একটা সাদা কাপড় বেঁধে ঝুল ঝাড়ছে, কখন উঁচু চেয়ারে দাঁড়িয়ে একটা ছবি পেড়ে নগেনকে বলেছে, 'বসে বসে দেখছ কি, একটু ধরতে পার না!' নগেন তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেছে। মল্লিকা তখন গোড়ালি উঁচু করে ছবিটা হুক থেকে খুলে শরীরের ভারসাম্য রাখতে না পেরে একদিকে টলে গেছে। নগেন ছবিটা না ধরে মল্লিকার সরু কোমরটা জড়িয়ে ধরে ছবিসমেত মল্লিকাকে কোলে করে মেঝেতে নামিয়ে এনেছে। মল্লিকা উচ্চতায় নগেনের চেয়ে ইঞ্চি দুয়েক কম ছিল। মল্লিকার সেদিনের চেহারা, সেদিনের স্পর্শ আজও নগেন মনে রেখেছে। কপালে মুক্তোর দানার মতো বিন্দু বিন্দু ঘাম। সিঁদুরের টিপটা অল্প একটু ঘষে গেছে। দু-একটা চুল কপালের ঘামের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। নাকের উপর অল্প একটু ঝুল জড়িয়ে আছে। জোরে

জোরে নিশ্বাস নেবার ফলে বুক ওঠা-নামা করছে। নগেন সেদিন নিজেকে সামলাতে পারেনি। একটু চপলতা করে ফেলেছিল যা তার স্বভাববিরুদ্ধ। এদিক ওদিক তাকিয়ে মল্লিকাকে একটা চুমু খেয়েছিল। মল্লিকাকে পাঁজাকোলা করে বিছানায় নিয়ে গিয়েছিল। ঘামে ভেজা ধুলো শরীরের গন্ধ নিয়েছিল। ছাড়া পেয়ে মল্লিকা ভীষণ রেগে গিয়েছিল, তুমি একটা অসভ্য গুণ্ডা, নিজের কাপড় গুছোতে গুছোতে বলেছিল, 'যত বয়েস হচ্ছে তত ছেলেমানুষী বাড়ছে তোমার।' নগেন হাসতে হাসতে বলেছিল, 'গালাগাল দিয়েছ যখন তখন তোমার ফাইন হবে, শিগগির এক কাপ চা খাওয়াও।'

সিস্টার চায়ের কাপটা নগেনের সামনে টেবিলে নামিয়ে রাখতে রাখতে বললেন, 'কি যে অত ভাবেন সব সময়! আপনার বোধহয় মেলাঙ্কোলিয়া হয়েছে, দাঁড়ান আপনারও চিকিৎসা করতে হবে।'

নগেন প্রথমে চমকে উঠেছিল। নিজেকে সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিয়ে একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, 'আমার স্বভাবটাই এই রকম, একটু বিষণ্ণ মতো, মনে হয় লিভারের ট্রাবল আছে।'

'লিভার আমি মেরামত করে দেবো, এখন দয়া করে চা খেয়ে নিন।'

নগেন তাকিয়ে দেখল, শুধু চা নয়, সঙ্গে দুটো ভাল বিস্কুটও রয়েছে। সিস্টার এক কাপ চা নিয়ে নগেনের মুখোমুখি বসলেন। প্রথম কয়েক মিনিট দুজনে নীরবে চায়ে চুমুক দিয়ে গেলেন। তারপর নগেনই প্রশ্ন করল, 'আপনি কি হাসপাতালেই থাকেন, কোয়ার্টারে?' সিস্টার চায়ের ঢোঁকটা গিলে নিয়ে বললেন, 'না না, ডিউটি শেষ হলে আমি চলে যাই। আমার বাড়ি হাজরার কাছে, সেখানে আমার বাবা মা থাকেন।'

নগেনের আরো কিছু ব্যক্তিগত প্রশ্ন করার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু না, অভদ্রতা হবে ভেবে শুধু 'ও' বলে হাসি হাসি মুখে সিস্টারের দিকে তাকিয়ে রইল। ছেলেবেলায় মা মারা গিয়েছিলেন বলে নগেন চিরকালই স্নেহের কাঙাল। কেউ একটু স্নেহ করলেই সে গলে যায়। সিস্টারের ব্যবহারে নগেনের তরল স্নেহ ইতিমধ্যেই তাঁর প্রতি গড়াতে শুরু

করেছে। এতক্ষণ একটা মথ জানলার জালিতে বসে ছিল, সেটা হঠাৎ উড়তে উড়তে গ্যাসবার্ণারের দিকে চলে গেল।

নগেন খুব করুণ গলায় সিস্টারকে অনুরোধ জানাল, 'আমার মেয়েটাকে আপনি একটু নিজের মতো করে দেখবেন, এই হাসপাতালে কে কার বলুন, মা-মরা মেয়ে, ওর মনটা একদম ভেঙে গেছে।' সিস্টার তাঁর চায়ের কাপটা ঠোঁটের কাছাকাছি ধরে রেখে নগেনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'আমি জানি, আপনার মেয়েকে আমি প্রথম দিন থেকেই ভালবেসে ফেলেছি, এত মিষ্টি স্বভাব, দেখবেন ও জীবনে সুখী হবে।'

'ভবিষ্যৎ বড় অনিশ্চিত, এখনই কিছু বলা যায় না, আর মানুষই নিজের নিজের ভবিষ্যৎ তৈরি করে এটাও বোধহয় ঠিক নয়, ভাগ্যকে মানতেই হয়।' নগেন নিজের জীবনের ঘটনা থেকেই কথাটা তুলল। 'ভাগ্যকে আমি অস্বীকার করছি না, আমার নিজের জীবন দিয়ে তা বুঝেছি, তবে কি জানেন মানুষের মুখে কিন্তু ভবিষ্যতের ছায়া পড়ে', সিস্টার কথা বলতে বলতে খালি চায়ের কাপ টেবিলে নামিয়ে রাখলেন। নগেনের মনে হল, সিস্টারের মুখটা যেন ক্রমশ বিষণ্ণ হয়ে আসছে। মানুষ যতই হাসিখুশি থাকার চেষ্টা করুক, নদীর মতো জীবন অনবরতই পলি ফেলতে ফেলতে এগিয়ে চলেছে। সেই পলিতে বালির কণার মতো বিন্দুবিন্দু সুখ চিকচিক করলেও বাকিটা শুধু প্রবাহের ক্লেশ আর ভাঙনের ভগ্নাবশেষ। নগেনের চা অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। ঘরের আলোটা তেমন জোর নয়, কেমন যেন মৃদু নিষ্প্রভ বিষণ্ণ। সিস্টার বোধহয় তাঁর অতীত জীবনের কথা ভাবছিলেন। অসংখ্য জীবনের বিশাল স্রোতধারায় ব্যক্তিজীবন প্রায়ই হারিয়ে যেতে চায়; কিন্তু কখনো কখনো দুর্বল মুহূর্তে স্বতন্ত্র সত্তা বেরিয়ে আসে, অনুভব করে, মিছিলের মুখে তখন বিষণ্ণতার ছায়া ঘনিয়ে আসে। এ যেন আকাশ! যে আকাশে সূর্যের খেলা, সেই আকাশেই আবার মেঘের ঘন অন্ধকার।

৪

হাসপাতাল থেকে দিনের শেষ যে দর্শনার্থী বেরিয়ে এলেন, সেই বোধহয় নগেন। হাসপাতালের বাইরে এসে নগেনের বেশ ভাল লাগল। এতক্ষণ শুধু রোগ, রোগী, ডেটল, ইথার, বিষণ্ণতা, মৃত্যুচিন্তা, বিশাল ঘর, উঁচু ছাদ, মৃদু চাপা আলো, লম্বা করিডর, ছায়া ছায়া মানুষ, অন্ধকার কোণ সব মিলিয়ে তাকে যেন চেপে ধরেছিল। বাইরের রাস্তায় নেমে নগেন যেন একটা গতি পেল। ফুটপাথ থেকে রাস্তায় পা দিতে যাচ্ছিল, একটু বোধ হয় অন্যমনস্কও হয়েছিল, একটা ট্যাক্সি গা ঘেঁষে হুশ করে ছুটে গেল রেস কোর্সের দিকে, তার পেছনেই দৌড়ল একটা মোটর সাইকেল, তার পেছনে একটা বাস, একের পর এক গাড়ির মিছিল শুরু হয়ে গেল। এতক্ষণ বোধ হয় মোড়ের লাল আলোয় সব আটকে ছিল, সবুজে ছাড়া পেয়েছে। নগেনের রাস্তা পার হওয়া হল না। বহুক্ষণ সিগারেট খায়নি। এইবার একটা সিগারেট ধরানো যেতে পারে ভেবে নগেন পকেটে হাত দিয়ে প্যাকেটটা পেল না। দেশলাইটা রয়েছে, প্যাকেটটা নেই। কোনো সময় ভুলে সিগারেটশুদ্ধু প্যাকেটটাই সে ফেলে দিয়েছে। আজকাল এই রকম ভুল প্রায়ই হচ্ছে। মনটাকে সে আর কিছুতেই বশে আনতে পারছে না, অবাধ্য ঘোড়ার মতো কোথায় যে ছুটছে!

নগেন সিগারেটের খোঁজে ভিক্টোরিয়ার দিকে এগোলো। এখনও তেমন একটা রাত হয়নি। তাছাড়া ভিক্টোরিয়ার কাছটা মাঝরাত অবধি জমজমাট থাকে। আইসক্রীম, ফুচকা, ভেলপুরী, সিদ্ধির মালাই, মসলা পান, ফুলের মালা, সারি সারি প্রাইভেট গাড়ি, হাসি, গান,

প্রসাধনের উগ্র গন্ধ, সব মিলিয়ে ভিক্টোরিয়া যেন একটা দ্বীপের মতো কলকাতার জীবনসমুদ্রে ভাসছে। নগেন জীবনে উচ্ছ্বাসের দিকটা প্রায় এড়িয়েই গেছে। সব সময়েই তার প্রবণতা ছিল একটু গভীরে যাবার। যেখানে মেলা, যেখানে কলরব, যেখানে উল্লাস সেখান থেকে নগেন সব সময় সরে আসতে চেয়েছে।

নগেন ভিড় বাঁচিয়ে একপাশে একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল। মাঠের দিক থেকে ভিজে ভিজে হাওয়া আসছে। দাঁড়ানো গাড়ির সারি থেকে একটা দুটো চলে যাচ্ছে, আবার নতুন গাড়ি এসে ঢুকছে। অন্ধকার মাঠের কোনো কোনো অংশ থেকে কখনো হাসি, কখনো গান উঠছে। বৃষ্টিতে ঘাস ভিজে না থাকলে নগেন হয়ত কিছুক্ষণ মাঠে গিয়ে বসত। বাড়ি যাবার তেমন কোনো তাড়া নেই। কি হবে তাড়াতাড়ি শূন্য বাড়িতে ফিরে গিয়ে!

কিছু দূরে এক সিমেন্ট বাঁধানো বেঞ্চি খালি হল। নগেন ধীর পায়ে হেঁটে গিয়ে একপাশে সাবধানে বসল। ফাঁকায় একটু বসতে পেরে তার খারাপ লাগছিল না। এদিকটা একটু অন্ধকার অন্ধকার থাকায় মাথার ওপর তারা-ভরা আকাশ বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ছেলেবেলায় নগেনের একটা প্রিয় অভ্যাস ছিল, দিগন্তের কাছাকাছি কোনো নিঃসঙ্গ তারা বেছে নিয়ে, সেই তারার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকা। তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ জলে ভরে আসত, আকাশের একপ্রান্তে একটা শুভ্র জ্যোতির্ময় মেঘের মতো কি ভেসে উঠত। নগেনের মনে হত তার দৃষ্টি যেন প্রসারিত হয়ে পৃথিবীর শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। সাধারণ দৃষ্টিতে যা দেখা যায় না এমনি সব বাড়ি, গির্জা, পাহাড়, মন্দির, মসজিদ, উদ্যান সে দেখতে পাচ্ছে আকাশের প্রান্তসীমায়।

নগেন অনেকদিন পরে আবার সেই পুরনো খেলায় মেতে উঠল। পশ্চিম আকাশে একটা উজ্জ্বল তারা জ্বলজ্বল করছে, সেই তারার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে নগেন সেই সিমেন্টের বেঞ্চিতে বসে রইল। হাতের সিগারেট হাতেই পুড়ে ছাই হল। আগের অভ্যাস নষ্ট হয়ে

গেছে, একটু তাকাতে না তাকাতেই চোখে জল এসে গেল, চোখ জ্বালা জ্বালা করে উঠল। অথচ মনে আছে ছাত্রজীবনে একটা নির্জন মন্দিরে কালী মূর্তির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে বসেছিল, এমন সময় দুটি মেয়ে প্রণাম করতে এসে তার স্থির চোখের দিকে তাকিয়ে ভয়ে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল।

চোখের জল মুছে নিয়ে নগেন আর একটা সিগারেট ধরাল।

এখন সে একটু নিশ্চেষ্ট হয়ে বসতে পারে। মনটাকে মুক্ত পাখির মতো আকাশে উড়িয়ে দিতে পারে। এখন তার করার মতো বিশেষ কোনো কাজ নেই। এমন কি সে কিছু ভাববেও না। এই এক বছরে সে অনেক ভেবেছে, সারা জীবনের ভাবনা যেন একবারে ভেবে নিয়েছে। হাওয়ায় রাস্তার উপর দিয়ে একটা আইসক্রীমের কাপ খড় খড় করে গড়িয়ে গেল। আইসক্রীমের কাপটা গড়িয়ে যেতেই নগেনের অনেক দিন আগের একটা পুরনো ঘটনা মনে পড়ল।

মল্লিকা তখন সবে বৌ হয়ে তাদের বাড়িতে এসেছে। নগেনের হাত থেকে তখনও দুর্বো-বাঁধা লাল সুতো খোলা হয়নি। বিয়ের সিল্কের পাঞ্জাবি তখনও হ্যাঙারে ঝুলছে। মল্লিকার বেনারসী তখনও কেচে বাক্সে ওঠেনি, তখনও খাটে পাতা আছে রেশমী জাজিম। ফুল-দানীতে রজনীগন্ধার স্তবক থেকে একটি দুটি ফুল ঝরে গেলেও বাকি ফুল সারা বাড়িতে বিয়ে বিয়ে গন্ধ ছড়াচ্ছে। নগেনের ছুটি তখনও শেষ হয়নি। নগেন মল্লিকাকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিল। দুপুরেই বেরিয়েছিল খাওয়াদাওয়ার পর। বেরোবার আগে নগেন বাবার অনুমতি নিতে ভোলেনি। প্রথমটা নগেন একটু ইতস্তত করেছিল। বৃদ্ধ মানুষকে বাড়ির পাহারায় রেখে যেতে তার একটু সঙ্কোচ হচ্ছিল। যদি কিছু ভাবেন। যদি ভাবেন বৌ নিয়ে স্ফূর্তি করতে চলেছে। বিয়ের পর থেকেই নগেনের বাবা কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন। নগেনের সঙ্গে সারাদিনে যা দু-চারটে কথা হত তাও যেন কত দূর থেকে উদাস ছাড়া ছাড়া ভাবে। নগেনের বাবা বোধ হয় ধরেই নিয়েছিলেন ছেলে

পর হয়ে গেছে। নগেন কিন্তু সব সময়েই শঙ্কিত হয়ে থাকত। বাবার সঙ্গে তার দীর্ঘদিনের অন্তরঙ্গ সম্পর্কে সে ফাটল ধরাতে চায়নি। নগেন ভেবেছিল তাদের ছোটখাটো সুন্দর সংসার আরো সুন্দর হয়ে উঠবে। গানে, গল্পে, হাসিতে, হল্লোড়ে জীবনের দিন তরতর করে বয়ে যাবে। ভাবনার সঙ্গে বাস্তবকে মেলানো গেল না। ফুলশয্যার পরের দিন থেকেই বোঝা গেল নগেনের বাবা দূরে সরে যেতে চাইছেন। একটা ব্যবধানের পাঁচিল তুলতে চাইছেন। মল্লিকার বিরুদ্ধে তাঁর স্পষ্ট কোনো অভিযোগ ছিল না, তবে মল্লিকা যে পরিবার থেকে এসেছে সেই পরিবার সম্পর্কে তাঁর একটা প্রচ্ছন্ন ঘৃণা ছিল। তিনি নিজে ছিলেন অন্তর্মুখী, আর মল্লিকারা ছিল বহির্মুখী। মল্লিকাকে কিছুতেই তিনি অন্তরঙ্গ হবার সুযোগ দিলেন না। মল্লিকা নগেনের বৌ হতে পারে কিন্তু তাঁর পুত্রবধূ হবার কোনো যোগ্যতাই যেন মল্লিকার ছিল না। মল্লিকার অপরাধটা কি বোঝার আগেই মল্লিকার বিচার হয়ে গেল। সবে নতুন সংসার পাততে এসে মল্লিকার অতশত বোঝার কথা নয়। সব স্ত্রীরই যেমন স্বামীর সঙ্গে এখানে ওখানে যাবার বাসনা থাকে, মল্লিকারও ছিল। মল্লিকার চাপে পড়েই নগেন সেদিন বেরিয়েছিল। তার নিজের তেমন বেরোবার ইচ্ছে ছিল না। নগেন অনুমান করেছিল এই বেড়াতে যাওয়া নিয়ে পরে একটা অশান্তি হওয়া খুব বিচিত্র নয়। মল্লিকার অনুরোধ রাখতে সে অনেকটা মরিয়া হয়েই বেরিয়ে পড়েছিল, যা থাকে বরাতে অনেকটা এই ভেবেই।

নগেন আর মল্লিকা প্রথমে চৌরঙ্গি পাড়ায় একটা সিনেমা দেখেছিল। তারপর খেয়েছিল কি একটা চীনে রেস্তোরাঁয়। আউটিংটা এখানে শেষ হলেই হয়ত ভাল হত ; কিন্তু মল্লিকা তা হতে দিল না। এত তাড়াতাড়ি শেষ হলে কি চলে! একটু এদিক ওদিক না বেড়ালে ব্যাপারটা বড় সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়। মল্লিকার চাপে পড়ে সন্ধ্যের মুখটায় দুজনে ভিক্টোরিয়ার কাছে চলে এল। মাঠ ভেঙে ভেঙে একটা নির্জন জায়গায় গিয়ে তারা বসল ঘাসের উপর পা ছড়িয়ে।

সেদিন কোন জায়গাটায় তারা বসেছিল! নগেন একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করল। অনেক দিন আগের কথা। তবু নগেনের মনে হল অন্ধকার মাঠের ওই পশ্চিম কোণে এখন যেখানে আলোকিত পুলিস আউট-পোস্টটা হয়েছে, ওই রকম কোনো একটা জায়গায়বোধহয় বসেছিল। নগেনের ইচ্ছে হল জায়গাটা একবার দেখে আসে। অন্ধকার, তাতে ক্ষতি কি! ঘাস না হয় একটু জলে ভেজা, তাতেই বা কি? নগেন সিমেন্টের বেঞ্চি ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। উঠে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে নগেনের মাথাটা যেন ঈষৎ ঘুরে গেল। অল্প সময়ের জন্যে চারিদিক যেন অন্ধকার হয়ে এল। তবে কি তার লো-প্রেসার হয়েছে? হতে পারে। খাওয়াদাওয়া শুধু কম হচ্ছে না, ভীষণ অসময়ে হচ্ছে। শরীরের যত্ন নেবার লোক চলে গেছে। কে আর তাকে মেরে ধরে খাওয়াবে। এখন সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। স্বেচ্ছাচারী হতেও বাধা নেই। শরীর নিয়ে ভাববার বয়েস অনেক দিন চলে গেছে। মাথা ঘোরাটা সামলে নিয়ে নগেন একটা আক্ষেপের হাসি হাসল। সে, কি ভীষণ সৌখীন ছিল! দাড়ি কামাবার জন্যে সেভিং ক্রীম ব্যবহার করত, ব্যবহার করত লোশান আফটার সেভ।' দিশী ব্লেড হলে চলত না। বাজার খুঁজেখুঁজে বিলিতী ব্লেড যোগাড় করত বেশি দাম দিয়ে। বিলিতী সাবানের সখ ছিল। ভাল সেন্ট না হলে চলত না। সপ্তাহে দুবার চুল শ্যাম্পু করত, চুলে ব্যবহার করত তৈলহীন ক্রীম। সেই জীবনরসিক নগেনের এখন কি অবস্থা!

নগেন মাঠ ভেঙে ঘাস মাড়িয়ে পুলিশ আউট পোস্টের দিকে এগোতে লাগল। অন্ধকারে এদিকে-ওদিকে অনেক জোড়া-মূর্তি মাঠময় ছড়িয়ে আছে। নগেন সেইসব সান্নিধ্যের দৃশ্য গ্রাহ্য করল না। তার এক মাত্র লক্ষ সেই জায়গাটা যেখানে বহুদিন আগে সে আর মল্লিকা এমনি এক রাতে পাশাপাশি বসেছিল। পুলিস আউটপোস্টের প্রায় কাছাকাছি এসে নগেনের মনে হল কে যেন তার কানেকানে বলছে, নগেন, অতীতকে ফিরিয়ে আনা যায় না। এই মাঠ, এই ঘাস, এই পরিবেশ তোমার জীবন থেকে অনেক দূরে চলে গেছে, এখানে যারা বসে আছে

তাদের বসতে দাও, বিরক্ত কোরো না। জীবন বহতা পানির মতো এগিয়ে চলেছে, অধ্যায় থেকে অধ্যায়ে চলে যাও, এখানে এই মুহূর্তে তুমি বড় বেমানান। নগেন যেন নিজের ভুল বুঝতে পেরে ভীষণ লজ্জা পেল। সে একবার থমকে দাঁড়াল। এতক্ষণ অন্ধকারে চলার ফলে তার চোখ সয়ে গেছে। পশ্চিম আকাশে একটা সাদা মেঘ উঠে, মাঠে চাপা আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে। নগেন সেই আলোতে দেখল কিছু দূরে একটি মেয়ে একটি ছেলের কাঁধে মাথা রেখে ঘনিষ্ঠভাবে বসে ছিল, ছেলেটি নগেনকে পুলিস ভেবেই হোক, কিংবা অন্য কিছু ভেবে তাড়াতাড়ি মেয়েটিকে দূরে সরিয়ে দিল। মেয়েটির খোঁপায় জড়ানো যুঁই ফুলের গোড়ের মালা অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। গন্ধ ভেসে আসছে নাকে, নগেন নিজেকে খুব বিব্রত মনে করল। তখুনি সে ফিরে চলল যে দিক থেকে এসেছিল সে দিকে। এখানে, একা নগেনের স্থান নেই, সঙ্গে কোনো মল্লিকা থাকা চাই।

নগেন আবার ফিরে এল সেই সিমেন্টের বেঞ্চিতে। হয়ত আর একটু বসা যেত কিন্তু বেঞ্চিটা ইতিমধ্যেই এক অবাঙালী পরিবার দখল করে নিয়েছে। তারা হাসছে, হৈ হৈ করছে, ট্রানজিস্টার চটুল হিন্দীগান বাতাসে ছড়াচ্ছে। দলে একটি কম বয়সের মেয়ে আছে, তার উচ্ছ্বাস যেন সবচেয়ে বেশি। তার বুক থেকে বারেবারে লাল সিল্কের শাড়ির আঁচল খসে খসে পড়ছে। সংক্ষিপ্ত কাঁচুলির পাশ দিয়ে শুভ্র শরীর ভেসে উঠছে। মেয়েটি তার যৌবন দিয়ে জায়গাটিকে ভরপুর করে রেখেছে। মেয়েদের যৌবন পুরুষকে যেন ক্রীতদাস করে রাখে। মেয়েটির সঙ্গে নগেনের একবার চোখাচোখি হল। মেয়েটি কিছু গ্রাহ্যই করল না। সে তখন কি একটা মজার কথা শুনে শরীর দুলিয়ে হাসছে। তার কানের পাথরের দুল যত দুলছে তত চিকচিক করছে।

নগেন পথে পা বাড়াল। তার মনে পড়ল মল্লিকাও সেদিন ক্ষণে ক্ষণে এইভাবে অফুরন্ত হেসেছিল। নগেন ফুলের মালা কিনে খোঁপায় জড়িয়ে দিয়েছিল বলে খুব রেগে গিয়েছিল—'ওই সব মালাটালা জড়ালে নিজেকে

বারবধূ বলে মনে হয়। মালা পরাতে চাও তো ঘরে চল। এই সব ব্যাপার রাস্তাঘাটে বড় সস্তা হয়ে যায়।' মল্লিকার একটা অদ্ভুত আভিজাত্য ছিল, ব্যক্তিত্ব ছিল। চপলতা যতটুকু দেখা যেত, তা যেখানে-সেখানে যার তার সামনে নয়, বিশেষ পরিবেশে, বিশেষ কয়েকজনের সামনে। মল্লিকা চুল থেকে মালা খুলে হাতে জড়াল, ফেলে দেয়নি কারণ মল্লিকা জানত নগেন বড় অভিমানী। মল্লিকা আর নগেন পাশাপাশি হাঁটছিল হাত ধরাধরি করে। গল্পে গল্পে তারা বুঝতেই পারেনি রাত কত হয়েছে কিংবা পশ্চিমের আকাশে ঘনঘোর ঝড়ের মেঘ জমেছে। চৌরঙ্গি রোডের উপর ট্রামস্টপেজে আসতে আসতে বিশাল ঝড় উঠল। রাত যত বাড়তে থাকে আলোগুলোও জোর হতে থাকে। প্রথম ঝড়ে ধুলোর কুণ্ডলীতে আলো ঝাপসা হয়ে গেল। যত ঝরা পাতা, ঠোঙা, আইসক্রীমের খালি কাপ নগেন আর মল্লিকার চারপাশ দিয়ে গড়াতে গড়াতে চলেছে। মল্লিকা তখন নগেনের বুকে মুখ লুকিয়েছে। হাওয়ায় তার শাড়ির আঁচল হু-হু করে উড়ছে। ধুলো ঝড়ের পেছন পেছন এল বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি। মল্লিকা একটা কচি কলাপাতা রঙের শাড়ি পরেছিল, জলে ভিজে আস্তে আস্তে শাড়ির রঙটা গাঢ় হল। শরীরের সমস্ত ভাঁজ ও রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠল। চুল থেকে মোমের মতো সাদা মসৃণ জলের বিন্দু কপালে নামল। নাকের ডগায় জল, চোখের পাতায় জল। সময় তখন মধ্যরাতের দিকে গড়িয়ে চলেছে। রাস্তা প্রায় জনমানবশূন্য। শুধু বৃষ্টি, অসংখ্য ঘোড়ার খুরের মতো এক দিক থেকে আর এক দিকে দৌড়ে চলেছে। ট্রামের দেখা নেই, মাঝে মাঝে এক একটা বাস সমস্ত জানলা বন্ধ করে না থেমে সোজা চলে যাচ্ছে। একটা ছুটো খালি ট্যাক্সি গেল। নগেন থামাবার চেষ্টা করল, থামল না। মল্লিকা তখন মরিয়া হয়ে ট্রাম লাইনের জমা জলের উপর দিয়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াল। মল্লিকার তখনকার সেই সিক্ত চেহারা দেখে নগেন অবাক হয়ে গিয়েছিল, তার বৌ অত সুন্দর! মল্লিকার একবারের চেষ্টাতেই ট্যাক্সি থামল। নগেন জানত থামবে। মল্লিকার

তখনকার সৌন্দর্যে পৃথিবী পর্যন্ত তার গতি একবার থামাত তাকিয়ে দেখবার জন্যে। সর্দারজী তো থামাতে বাধ্য!

নগেন চমকে উঠেছিল, হঠাৎ তার কানের কাছে কেউ এত জোরে হেসে উঠবে সে ভাবেনি। দুটি অবাঙালী ছেলে, হৃষ্টপুষ্ট, শরীরের আয়তন অনুযায়ী হাসি। নগেন অন্যমনস্ক ছিল বলেই বোধ হয় চমকে উঠেছিল। অতীতের কথা ভাবতে ভাবতে নগেন ট্রাম রাস্তায় চলে এসেছে। এতক্ষণ তার কোনো খেয়ালই ছিল না। গাড়ি চাপা পড়েনি এই তার ভাগ্য। সেই রাতের চিন্তায় সে এত তন্ময় ছিল, তার মনে হচ্ছিল প্রকৃতই সে বৃষ্টিতে ভিজছে আর একটু দূরে দাঁড়িয়ে মল্লিকা ট্যাক্সি থামাবার জন্যে হাত তুলছে। তার চুল রাস্তার আলো পড়ে রুপোর মতো চকচক করছে। তার শাড়ির রঙ জলে ভিজে গাঢ় হয়েছে, পায়ের সঙ্গে সায়ার ভিজে লেশ জড়িয়ে গেছে, বৃষ্টির দানা নাচছে চারপাশ ঘিরে। নগেন অন্যমনস্ক মাথায় হাত দিল ভিজে চুল থেকে জল ঝেড়ে ফেলবে।

ধর্মতলার দিকে একটা ট্রাম যাচ্ছিল, নগেন উঠে পড়ল! ট্রামটা খালিই ছিল। অনেক রাত হয়েছে। শেষ বাস পাবে তো। নগেন জানলার ধারে বসল। অন্ধকার ময়দানের পাশ দিয়ে ট্রাম হু-হু করে ছুটে চলেছে। ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপ্টা লাগছে চোখে মুখে কপালে। ট্রামের টিকিট দেবার জন্যে পকেট থেকে পয়সা বের করতে গিয়ে নগেন দেখল রুমালটা নেই। মনে পড়ল রুমালটা পেতে সে বেঞ্চিতে বসেছিল, ওঠার সময় খেয়াল ছিল না, রুমালটা বেঞ্চিতেই পড়ে আছে। অনেক রাত অবধি রুমালটা নির্জনে পড়ে থাকবে, হাওয়ায় ওড়াউড়ি করবে, তারপর এক সময় স্মৃতির মতো হারিয়ে যাবে।

হঠাৎ নগেনের মাথায় একটা অদ্ভুত ছেলেমানুষী চিন্তা এল। মানুষ মারা যাবার পরও তার আত্মা ভালবাসার জন কিংবা জায়গা ছেড়ে যেতে চায় না। এমনও তো হতে পারে ভিক্টোরিয়ার মাঠে আরো গভীর

রাতে, মাঠ একেবারে জনশূন্য হয়ে গেলে, তারারা আরো অনেকটা পশ্চিমে হেলে গেলে, বাতাস আরো ঠাণ্ডা হয়ে এলে মল্লিকা সেই জায়গাটা কলাপাতা রঙের শাড়ি পরে দু'ভাঁজ করা হাঁটুতে হাত রেখে চুপ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। মল্লিকার ভীষণ বাঁচার আকাঙ্ক্ষা ছিল। সেই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সে হয়ত বসে থাকে একটা শরীরের আকৃতি নিয়ে। তারপর রাত যত ভোরের দিকে এগিয়ে চলে সেও গুঁড়োগুঁড়ো কুয়াশার মতো আকাশ আর জমির মাঝে একটা আঁচলের মতো দুলতে দুলতে সূর্য-সীমায় মিলিয়ে যেতে থাকে। হয়ত মল্লিকা এখনও কোনো কোনো রাতে চৌরঙ্গি রোডের উপর দাঁড়িয়ে হাওয়ায় আগুনে আঁচল উড়িয়ে গাড়ি থামায়। হয়ত মধ্যরাতে হাস-পাতালে নিস্তব্ধ ওয়ার্ডে সে উল্কার মাথার কাছে এসে বসে।

নগেন যখন বাড়ি ফিরল তখন রাত প্রায় এগারোটা। সারাদিনের পর খুব ক্লান্ত লাগছিল। মাথাটা ভারি। পা দুটো যেন চলছে না। যে রান্না করে তাকে বলাই আছে দেরি দেখলেই সে যেন তালা দিয়ে চলে যায়। নগেনের কাছে আর একটা চাবি থাকে, কোনো অসুবিধে হয় না। নগেন চাবি খুলে অন্ধকারে অনুমান করে করে সুইচবোর্ডের দিকে এগিয়ে গেল। ক্রমশই অন্ধকার সয়ে এল। অস্পষ্ট সে সবই দেখতে পাচ্ছে, চেয়ার, টেবিল, বুককেস, মেঝেয় পাতা কার্পেট, দোতলায় ওঠবার সিঁড়ির ধাপ। অন্ধকারের আয়োজনটা আলো জ্বেলে চুরমার করে দিতে ইচ্ছে করছিল না। নগেন ঢোকবার দরজাটা বন্ধ করে, আলো না জ্বেলে, জানলার ধারে একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসল। পাঞ্জাবিটা চেয়ারের পিঠে খুলে রাখল। নিজেকে অসম্ভব নিঃসঙ্গ লাগছিল নগেনের। এক সময় ছিল যে সময় নগেন বাড়ি ফিরত কত উৎসাহ নিয়ে, কত আকর্ষণ নিয়ে। দরজায় তিনবার মৃদু টোকা দিলেই মল্লিকা দরজা খুলে দিত হাসি মুখে, হাতের জিনিসপত্র ধরে নিত। বসে একটু জিরোতে না জিরোতেই এক গেলাস জল এগিয়ে দিত, বেশি রাত না হলে চা আর পাঁপড় ভাজা।

সেই অন্ধকার সাজানো ঘরে বসে নগেন যেন অনুভব করছিল, মল্লিকা অস্পষ্ট শরীরে ঘর থেকে ঘরে, প্যাসেজে, সিঁড়িতে, সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। বাতাসে হাল্কা হয়ে ভাসছে তার চুলের গন্ধ, চুড়ির শব্দ। জীবনের যে সব মুহূর্তে মল্লিকা সবচেয়ে আহত হয়ে ছিল সেই মুহূর্তগুলো যেন বড় বেশি মনে পড়ছে। সেই বিব্রত মুখ, সেই জলভরা চোখ। উপায় থাকলে শ্লেটের লেখার মতো মল্লিকা চলে যাবার আগে সে জল দিয়ে সব কিছু মুছে দিত।

মল্লিকা প্রথম আঘাত পেল সেদিন, যেদিন তারা দুজনে ভিক্টোরিয়ার কাছ থেকে ভিজে ট্যাক্সিতে বাড়ি ফিরল। রাত তখন প্রায় এগারোটা। গাড়িতে নগেন ট্যাক্সির ভাড়া মেটাতে মেটাতে বলেছিল, 'ভীষণ রাত হয়ে গেল, দেখ আবার কি হয়।'

মল্লিকা কাপড় গুছোতে গুছোতে বলল, 'আমাদের দোষে তো আর হয়নি, বৃষ্টি এসে গেলে আমরা কি করতে পারি।' মল্লিকাকে পিছনে অন্ধকারে রেখে নগেন বন্ধ দরজার কড়া নাড়ল, একবার, দুবার, তিনবার, চারবার। ওপর থেকে কোনো সাড়া নেই। মল্লিকা বলল, 'বৃদ্ধ মানুষ, বাদলায় হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছেন।'

নগেন বাধ্য হয়েই বেশ জোরে জোরে বার কয়েক কড়া নাড়ল। এবার কাজ হল। সিঁড়িতে চটির আওয়াজ ক্রমশই নিচে নেমে এল। চটির আওয়াজ এমন একটা জিনিস যা থেকে মানুষের মেজাজ অনুমান করে নেওয়া যায়। মেয়েদের হাতের চুড়ির শব্দও তাই। নগেনের বাবা শব্দ করে দরজা খুলে দিলেন। মুখ মেঘগম্ভীর, চোখের চাহনি তেরছা ক্রূর প্রতিহিংসাপরায়ণ। নগেন এই দৃষ্টির সঙ্গে পূর্বপরিচিত। এ হল ঝড়ের পূর্বাভাষ। এ ঝড়ের চেহারা কি দাঁড়াবে বলা শক্ত। নগেন আগেও দেখেছে সারা সংসারে একটা তাণ্ডব শুরু হয়ে যায় এবং কি চালে কে কে কাত হবে তা একেবারেই অনুমান করা যায় না।

নগেনের বাবা দরজা খুলে দিয়ে একপলকে পুত্র ও পুত্রবধূকে দেখে নিয়ে সবেগে সিঁড়ির দিকে চলে গেলেন। নগেন কিছু বলার ও জিজ্ঞেস

করার সুযোগ পেল না। নগেনের বাবা দোতলা থেকে খুব কাটা কাটা করে বললেন, 'স্ফূর্তি করার সময় স্ফূর্তি তো করবেই তবে শরীরটা বাঁচিয়ে। তোমার স্ত্রী যে ফ্যামিলির মেয়ে তার কাছ থেকে আমি শালীনতা আশা করি না তবে বাড়াবাড়িটা একটু রয়ে সয়ে। এইটুকু জেনে রাখবে "স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়, পরোধর্ম ভয়াবহ"।' নগেন দরজার পাপোশে দাঁড়িয়ে ছুঁড়ে মারা মন্তব্য বিনা প্রতিবাদে হজম করার চেষ্টা করল। পেছনেই একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল মল্লিকা। নিচু হয়ে জুতো রাখছিল। সে যখন উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াল, দুজনে মুখো-মুখি, কারুর মুখে কোনো কথা নেই। মল্লিকার চোখ জলে চিকচিক করছে। নগেন ভেবে পেল না কি ভাবে সে মল্লিকাকে শান্ত করবে। মল্লিকাই প্রথমে কথা বলল, 'দেখ ওনার খাওয়া হয়েছে কিনা? সত্যিই তো আমরা খুব দেরি করে ফেলেছি। বৃদ্ধ মানুষ, এতক্ষণ একা বাড়ি আগলে ছিলেন, তাই হয়ত রেগে গেছেন। তোমাকে আর কোনো দিন বেড়াতে যাবার কথা বলব না।'

প্রচুর খোশামোদ, মার্জনা ভিক্ষা, কোনো কিছুতেই নগেন তার বাবার মন টলাতে পারল না। তাঁর সেই এক কথা, 'আমার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, আমি একটা নিয়মে চলে এসেছি, নিয়মে থাকতে চাই, বেশি রাতে আমার খাওয়া চলে না, আমার জন্যে ভাবতে হবে না, বয়েস হয়েছে, যাবার সময় হয়েছে। যাও, তোমরা খাওয়াদাওয়া করে শুয়ে পড়, তোমাদের এখন তাড়াতাড়ি শোবার দরকার।' শেষ কথায় যে ইঙ্গিত ছিল তা শুনে নগেন স্তম্ভিত হল। মনে পড়ল কয়েকদিন আগেই নগেনের বাবা তাঁর কোনো এক আত্মীয়াকে বলছিলেন, 'আজকালকার মেয়ে আর কত ভাল হবে, সায়া দেখিয়ে ধুম ধুম করে সারা বাড়িতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বাজারের মেয়েছেলের সঙ্গে তফাত কোথায়।' নগেন কথাটা কোনো ক্রমে শুনে ফেলেছিল। মল্লিকাকে সেই দিনই সাবধান করে দিয়েছিল, 'তোমার সায়াটা একটু তুলে পোরো যেন কাপড়ের তলা থেকে লেস না বেরিয়ে থাকে।' নগেনের কথা শুনে মল্লিকা খুব অবাক

হয়েছিল। নগেন এইটুকু বুঝল, মল্লিকার সঙ্গে তার বাবার সম্পর্ক কোনো দিনই সহজ হবে না। তার বাবা ভীষণ একটা কমপ্লেক্সে ভুগছেন।

নগেন কথা না বাড়িয়ে আস্তে আস্তে নীচে নেমে এল। মল্লিকা সিঁড়ির শেষ ধাপে মুখে উৎকণ্ঠা মেখে দাঁড়িয়েছিল—'না উনি কিছু খাবেন না, রাত হয়ে গেছে'।

'সে কি গো! এরচেয়ে কত রাতে উনি খেয়েছেন। এই তো কয়েক দিন আগে গান বাজনায় বসেছিলেন সেদিন তো প্রায় রাত বারোটায় খেলেন।'

'কি বলব বল ? সে দিনে আর আজকে অনেক তফাত।'

'এক কাজ কর, কিছু মিষ্টি আছে, মিষ্টি আর জল দিয়ে এস, সারা রাত না খেয়ে থাকবেন!' নগেন সিঁড়ির প্রথম ধাপে আলোর তলায় অনেকটা হাল ভাঙা নৌকোর নাবিকের মতো হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আলোর কাছে শব্দ করে একটা বাদুলে পোকা উড়ছিল। মল্লিকা একটা বড় কাঁচের ডিশে চারটে সন্দেশ, পরিষ্কার একটা গেলাসে এক গেলাস জল এনে সাবধানে নগেনের হাতে তুলে দিল। মিষ্টি হাতে নগেন উপরে উঠে দেখল বাবা দরজা বন্ধ করে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছেন। নগেন ডাকল, বন্ধ দরজায় হাতের চাপ দিয়ে মৃদু শব্দ করল, কোনো ফল হল না। বেশি শব্দ কিম্বা ডাকাডাকি করতে ইচ্ছা করল না। নগেন ধীর পায়ে সিঁড়ির ধাপ গুনে গুনে নেমে এল। মল্লিকা ব্যাপারটা বুঝেছিল। সেও আর বেশি বাড়াবাড়ি করার পক্ষপাতি ছিল না। সেদিন আর কারুর খাওয়া হল না। নগেনের বেশ খিদে পেয়েছিল। মল্লিকারও পাওয়া স্বাভাবিক। একে একে সব আলো নিভল। দুজনে পাশাপাশি কোনো কথা না বলে অনেকক্ষণ জেগে শুয়ে রইল। এক সময় মল্লিকার কপালে হাত রাখতে গিয়ে নগেন অনুভব করল মল্লিকা নিঃশব্দে কাঁদছে, তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়েছে। সে রাতে নগেনের অসম্ভব রাগ হয়েছিল। যে পিতার জন্যে সে ছেলেবেলা থেকেই তটস্থ, পান থেকে চুন খসার সুযোগ পর্যন্ত দেয়নি, জীবনে পিতার অনুমতি ছাড়া কোনো

কাজ করেনি, এমন কি একা একা কখনও বেড়াতে যায়নি বা সিনেমা পর্যন্ত দেখেনি, বিয়ের আগে পর্যন্ত একই বিছানায় শুয়েছে, অসুখে মেয়েদের চেয়ে নিপুণ হাতে সেবা করেছে তার বিনিময়ে সে এই ধরনের ব্যবহার একেবারেই প্রত্যাশা করেনি। সেদিনের সেই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্যে নগেন একটা অদ্ভুত রাস্তা বেছে নিল। হ্যাঁ, সে এইবার সত্যি সত্যিই ফূর্তি করবে। সারা রাত ধরে সে একটা উন্নত পশুর মতো নারীসঙ্গ করবে। ভাল ছেলে! চরিত্রবান ছেলে! সমস্ত পুরনো ধারণা সে চুরমার করে দেবে। জীবনকে সে স্বার্থপরের মতো ভোগ করবে। মল্লিকা নগেনের এমন চেহারা আগে কখনো দেখেনি। মল্লিকা বুদ্ধিমতী মেয়ে। সেও বুঝেছিল,নগেন যা করছে তার অধিকাংশই আরোপিত। প্রচণ্ড চেষ্টা করেই সে কামনার মৃদু শিখাকে একটা অগ্নি-কুণ্ডে পরিণত করতে চাইছে। রাত ভোর হয়ে এল, প্রথম পাখি ডেকে উঠল। দুটি দেহ তখন সম্পূর্ণ ক্লান্ত। অনিশ্চিত একটা ভয়ঙ্কর ভবিষ্যৎকে সামনে রেখে নিতান্তই প্রাকৃতিক কারণে তারা ঘুমিয়ে পড়ল।

অন্ধকারে বসে বসেই নগেন একটা সিগারেট ধরাল। নগেনের হাত বেশ কাঁপছে। উত্তেজনায় কাঁপছে না দুর্বলতায়, নগেন ঠিক বুঝতে পারল না। পায়ের দিকে দু-একটা মশা কামড়াচ্ছে। এদিকে গাছ-পালার জন্যেই বোধহয়, মশা একটু বেশি। বাড়ি একেবারে নিস্তব্ধ। বাইরের জগৎও ঘুমিয়ে পড়েছে। বহুদূর থেকে একটা সানাইয়ের শব্দ ভেসে আসছে। শব্দটা মাঝে মাঝে আসছে আবার হারিয়ে যাচ্ছে। দরজার বাইরে ফলসা গাছের একটা ডাল মাঝে মাঝে হাওয়ায় দরজা ছুঁয়ে যাচ্ছে। খাবার ঘরে, রান্নাঘরে কিংবা সিঁড়ির তলার লম্বা টেবিলে একটা ইঁদুর মাঝে মাঝে খড় খড় করছে। সারা বাড়িতে এখন একটি মাত্র শব্দ। দোতলায় একটা ওয়াল-ক্লক আছে। নগেনের বাবা পছন্দ করে কিনে দোতলায় তাঁর ঘরের বাইরে ঝুলিয়েছিলেন। সেই ঘড়িটার টিক্ টিক্ শব্দ সারা বাড়িতে

ছড়িয়ে পড়ছে। নগেন ছাড়া বাড়িতে ঘড়িটাই যেন জীবন্ত। দোতলার ঘরে বাবা থাকতেন। তিনি চলে যাবার পর ঘরটা বন্ধই থাকে। নগেন সপ্তাহে একদিন শুধু উপরে ওঠে, ঘড়িটায় দম দেবার জন্যে। মাসখানেক তো ঘড়িটা বন্ধই ছিল!

প্রায় বারোটা বাজল। নগেনের কিছুই খেতে ইচ্ছে করছিল না। তবে শোবার আগে তাকে স্নান করতেই হবে। সারাদিনের ধুলো ঘামে সারা শরীরে একটা অস্বস্তি। সিগারেটের শেষ অংশটা জানলার বাইরে ফেলে দিয়ে নগেন উঠে দাঁড়াল। অন্ধকারে এখন সে সবই দেখতে পাচ্ছে। সুইচ টিপে আলো জ্বালাতেই, আলো যেন প্রচণ্ড আক্রোশে অন্ধকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। নগেন চোখ বুজিয়ে ফেলেছিল। চোখ খুলতেই টেবিলের উপর একটা চিঠি পড়ে আছে দেখল। নগেন অবাক হল, কার চিঠি! কেউ তো তাকে চিঠি লেখে না! তাকে চিঠি লেখার লোক কোথায়! নগেন খামটা হাতে তুলে নিল। হাতে লেখা দেখে ঠিক বুঝতে পারল না, কার চিঠি! খামটা সাবধানে খুলে চিঠিটা বের করল।

চিঠিটা লিখছে তার শালী ফুলা। নগেন আশ্চর্য হল। নগেনের সঙ্গে শ্বশুরবাড়ির সম্পর্ক চিরকালই ছাড়া ছাড়া। মল্লিকার মৃত্যুর পর সমস্ত যোগাযোগই প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ আবার ফুলার চিঠি কেন? ফুলা লিখেছে, সামনেই তার এম· এ· পরীক্ষা, সে একটু নির্জনে মাস খানেক পড়াশোনা করতে চায়। তাদের নিজেদের বাড়ির পরিবেশ জামাইবাবু ভালই জানেন। সেদিক থেকে জামাইবাবুর বাড়ির পরিবেশ লেখাপড়ার পক্ষে খুবই অনুকূল। অতএব সে আগামী-কাল থেকেই জামাইবাবুর বাড়িতে এক মাসের জন্যে এসে থাকতে চায়। জামাইবাবুর এতে আপত্তির কোনো কারণ থাকতে পারে না জেনেই অনুমতির অপেক্ষায় না থেকে সে সটান চলে আসছে। নগেন চিঠিটা টেবিলেফেলে রাখল। ফুলার সঙ্গে তার কুটুম্বিতার সম্পর্ক সুতরাং আপত্তির কিছু থাকলেও মুখ ফুটে বলতে পারবে না। নগেন এর বেশী

আর কিছু ভাবতে পারল না। সারা দিনের পর তার মাথা ঝিমঝিম করছে। এখন বিছানায় গিয়ে সটান শুতে পারলেই হয়।

নগেন ব্যক্তিগত জীবনে কত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তা তার বাথরুম দেখলেই বোঝা যায়। একেবারে ঝকঝকে তকতকে। সে রোজ সকালে নিজে হাতে বাথরুম পরিষ্কার করে। শাওয়ারের তলায় দাঁড়িয়ে সে একটু আরাম বোধ করল। এতক্ষণ তার মাথার ব্রহ্মতালুতে যেন হাতুড়ির ঘা পড়ছিল। চোখ জ্বালা করছিল। ভাদ্রের পড়ন্ত বেলার রোদ তাকে প্রায় পুড়িয়ে দিয়েছে। ভাল বিলিতি সাবানের অভ্যাসটা নগেন এখনও বজায় রেখেছে। মধ্যরাতের নিস্তব্ধ বাড়িতে শাওয়ারের হিস হিস শব্দ নগেনের কেমন ভৌতিক মনে হল। বহুযুগের ওপার থেকে কোনো বন্ধ দরজা খুলে একরাশ মূর্তি হুড়োহুড়ি করে বেরিয়ে আসছে। নগেনের সারা শরীর বেয়ে ঠাণ্ডা জলের প্রবাহ কুলকুল করে পায়ের তলা দিয়ে নেমে বাথরুমের নর্দমা দিয়ে বেরিয়ে চলেছে। চোখের ওপর দিয়ে যখন পাতলা জলের ধারা নামছে তখন বাথরুমের আলোটা কেমন অদ্ভুত ঘোলাটে হয়ে উঠছে! নগেনের মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল সে যদি এই অবস্থায় হঠাৎ মারা যায় তা হলে কি হবে! বাথ-রুমের একদিকের দেয়ালে হেলে থাকবে তার উলঙ্গ শরীর। সারা রাত ধরে তার মৃত শরীর বেয়ে অফুরন্ত জল গড়িয়ে যাবে। ভোরের সঙ্গে সঙ্গে বাথরুমের জোরালো আলোটা ফ্যাকাশে হয়ে যাবে। জল জমতে জমতে ক্রমশ তার শরীর ডুবিয়ে দেবে। বৃষ্টির জলে বালতি ভরে এলে যেমন শব্দ হয় সেই রকম একটানা শব্দ উঠবে।

নগেন মুখটা উঁচু করে শাওয়ারের তলায় কিছুক্ষণ ধরে রাখল। প্রথমে সে চোখ দুটো বুজিয়ে রেখেছিল, মুখটা একটু সরিয়ে নিয়ে চোখ খুলতেই বাথরুমের উঁচু তাকের শেষ কোণে কিসের ওপর নজর পড়ল। চোখে জল থাকায় প্রথমে বুঝতে পারছিল না কি ওটা। শাওয়ার বন্ধ করে একটু এগিয়ে যেতেই বুঝতে পারল, কয়েকটা চুলের কাঁটা। আশ্চর্য! এতদিন নজরে পড়েনি কেন? মল্লিকার চুলের কাঁটা। শেষ

যেদিন স্নান করেছিল সেদিন হয়ত খুলে রেখেছিল। তারপর ভুলে গিয়েছিল। কাঁটা কটা হাতে তুলে নিয়ে নগেন বাথরুমের বাইরে এসে বাথ ম্যাটের উপর দাঁড়াল। কাঁটাগুলোয় তখনও মাথার তেল লেগে আছে। নগেন নাকের কাছে এনে ঘ্রাণ নিল। খুব ফিকে জবাকুসুমের গন্ধ পাওয়া যায়। নগেন এতক্ষণ খেয়াল করেনি, সে সম্পূর্ণ উলঙ্গ। গায়ের জল মুছতে ভুলে গেছে। গায়ের জল প্রায় শুকিয়ে এসেছে। মাথার চুল থেকে তখনও ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে। তোয়ালেটা মাথায় জড়িয়ে উলঙ্গ নগেন বাথরুমের দরজা বন্ধ করে সমস্ত আলো নিভিয়ে শোবার ঘরে চলে এল। এখন সে একটু ঘুমোতে চায়। কাঁটাগুলো যত্ন করে ড্রেসিং টেবিলের ওপর রাখল। কাঁটাগুলো রাখতে গিয়ে সেই রুপো-বাঁধানো চিরুনিটা একবার দেখতে ইচ্ছে করল। চিরুনিটা আরশির তলায় একটা ব্রাশে গাঁথা ছিল। নগেন চিরুনিটা হাতে তুলে নিল। চিরুনিটার রুপোর অলঙ্করণের সঙ্গে একটা লম্বা চুল আটকে রয়েছে। শেষ মল্লিকা যেদিন মাথার চুলের জট ছাড়িয়েছিল সেই দিনই হয়ত অনেক চুলের সঙ্গে এই চুলটা আটকে গিয়েছিল। সেই থেকেই কিভাবে যেন চুলটা রয়ে গেছে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে।

কোঁকড়ানো চুলটার দিকে তাকিয়ে নগেন অনেকক্ষণ তন্ময় হয়ে বসে রইল। চোখের সামনে তার অনেক দিনের অনেক পুরনো দৃশ্য ভেসে উঠল। ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে মল্লিকা চুল আঁচড়াচ্ছে, দাঁতে চুলের ফিতে চেপে শক্ত করে গেঁট বাঁধছে। শোবার আগে পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে গোড়ালি তুলে দরজার ছিটকিনি আটকাচ্ছে। ঘরের একপাশে সরে গিয়ে নগেনের দিকে পেছন ফিরে ব্লাউজটা পিঠের দিকে টেনে এনে ব্রেসিয়ার খুলে দু আঙুলে ফিতে ধরে আলনায় আলগোছে দুলিয়ে দিচ্ছে। খাটের একপাশে বসে পাপোশে পা মুছে জোড়া পা দুটি ঘুরিয়ে বিছানায় তুলে নিচ্ছে। নগেন চুলটা সযত্নে খামে ভরে ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে ভরে রেখে দিয়ে আলো নিভিয়ে দিল।

বালিশে মাথা রেখে ভাল লাগল না। চুল ভীষণ ভিজে। ভাল করে

মোছা হয়নি। সর্দি না হয়। মাথার তলায় হাত রেখে মাথাটা বালিশ থেকে একটু উঁচু করে রাখল। একটা ছুটো হাই উঠল। ঘুম কি সহজে আসবে! চোখ বুজিয়ে সে গুনতে শুরু করল, এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ····। বাইরের লম্বা টেবিলে ইঁদুর খুটখুট করছে। দক্ষিণের হাওয়ায় পুবের দেয়ালে ঝোলানো একটা ক্যালেণ্ডার খসখস করছে। বাইরের অন্ধকার সিঁড়িতে একটা মট্ করে শব্দ হল, কেউ হাঁটু ভেঙে উঠতে গেলে যেমন হয়। এই শব্দটা রোজই হয়। কেন হয়, নগেন জানে না। নগেন গুনছে, পঞ্চাশ, একান্ন, বাহান্ন····।

নগেন সে রাতে অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখল। স্বপ্ন কোথায় শুরু হল তা মনে পড়ে না তবে যে অংশটুকু মনে ছিল, তা এই রকম : সবে বোধহয় বৃষ্টি হয়ে গেছে। নগেন একটা সবুজ ভিজে মাঠের উপর দাঁড়িয়ে আছে। সামনেই একটা আলোকস্তম্ভ থেকে জোরালো আলো ঠিকরে পড়ছে। হাত খানেক দূরে একটু জল জমে আছে। সেই জলের পাশ থেকে অজস্র প্রজাপতির মতো এক ধরনের পোকা ফড়ফড় করে আলোর দিকে উড়ে যাচ্ছে। তাদের ডানায় আলো কাঁপছে। নগেন চুপ করে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখছে। হঠাৎ কে যেন দূর থেকে বলে উঠল, দাঁড়িয়ে পড়লেন কেন, চলে আসুন। নগেন জলটাকে পাশ কাটিয়ে আলোকিত সেই মাঠ থেকে একটা উঁচু অন্ধকার জায়গায় উঠে এসে দেখল কিছুদূরে একটু নীচুতে দু-সারি ট্রামলাইন পাতা রয়েছে। আলো থেকে অন্ধকারে এসে সে যেন কিছুই দেখতে পাচ্ছে না অথচ তাকে লাইন পেরোতে হবে। কানে ভেসে আসছে তারের উপর ট্রামের ট্রলির ঘর্ষণের আওয়াজ। নগেন আন্দাজে ট্রামলাইনের উপর পা রাখতেই, একটা ট্রামের হেড-লাইটের আলোতে তার চোখ ঝলসে গেল। সে আর এক পাও না এগিয়ে লাইনের ওপরেই দাঁড়িয়ে পড়ল। ট্রামটা ধীরে ধীরে একেবারে তার গায়ের কাছে এসে থেমে পড়ল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে অন্ধকার থেকে কে যেন বেরিয়ে এসে তার হাত ধরে লাইনের ওপারে নিয়ে গেল। নিয়ে যেতে যেতে বলল, 'ইস, এখুনি যে চাপা পড়তেন! আপনি

দেখছি খুব ক্লান্ত। একটু বিশ্রাম করা দরকার। দাঁড়ান দেখি। নগেনের সামনেই বিশাল এক বাড়ি। দেয়ালে একটা ছোট্ট দরজা, বন্ধ। একটু উঁচুতে একটা ছোট জানলা খোলা। দরজার সামনে টুলে একজন দরোয়ান বসে আছে। সাদা জামা পরা লোকটি এগিয়ে গিয়ে দরোয়ানকে কি যেন বললেন। ভদ্রলোক ফিরে এসে নগেনকে বললেন, দরোয়ান রাজী হয়েছে, ওই ছোট দরজাটা চুপিচুপি খুলে দেবে, আপনি টুক করে ঢুকে পড়ুন।

নগেন অন্ধকারে হাতড়ে সেই দরজা দিয়ে একটা মাঝারি ঘরে এসে ঢুকল। ঘরে একটা চাপা আলো। আলোর উৎসটা নগেন খুঁজে পেল না। ঘরটাকে সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। কী সর্বনাশ! এ যে এক মহিলার ঘর। ঘরের কোণে একটা আনলায় শাড়ি, পেটিকোট, ব্লাউজ, ব্রা ঝুলছে। ঘরের একপাশে একটা তারে শাড়ি শুকোচ্ছে। শাড়িটার রঙ টকটকে লাল। শাড়ির পাশেই রয়েছে টকটকে লাল রঙের একটা ব্লাউজ, তার পাশেই রয়েছে ধবধবে সাদা রঙের একটা ব্রা। ঘরের আর এক কোণে এলোমেলো ভাবে পড়ে সাদা একজোড়া হাই-হিল জুতো। বিছানার চাদরটা এলোমেলো। আর বিছানার ঠিক মাঝখানে একটা গাঢ় কমলালেবু রঙের রেশমের পেটিকোট ছাড়া রয়েছে। বিছানার উপর দাঁড়িয়ে কেউ কোমরের ফাঁস আলগা করে দিলে যেমন পায়ের কাছে ভাঁজে ভাঁজে খুলে পড়ে ঠিক সেই ভাবে। সাদা ধবধবে ছুটো দড়ির মাথা একপাশ দিয়ে বেরিয়ে এসে খাটের পাশে ঝুলছে।

নগেনের ভীষণ ভয় করছিল। ভদ্রমহিলা যদি এখুনি এসে পড়েন কী হবে! ভয় পেয়ে যদি চিৎকার করে ওঠেন! চারদিক থেকে যদি লোকজন দৌড়ে আসে! তাহলে কী হবে! ছি ছি কী লজ্জা! নগেন এই সব ভাবতে ভাবতেই গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে একজন মহিলা সেই ঘরে এসে ঢুকলেন, পরনে তাঁর নার্সের পোশাক। মাথায় একটা ছোট সাদা টুপি। টুপির পাশ দিয়ে একরাশ কালো চুল পিঠ ছাপিয়ে কোমর পর্যন্ত নেমে গেছে। ভদ্রমহিলাকে দেখে নগেনের শরীর

ভয়ে হিম হয়ে গেল। মহিলা কিন্তু নগেনকে দেখতে পেয়েছেন বলে মনে হল না, অথচ নগেন ঘরের মাঝখানে জলজ্যান্ত দাঁড়িয়ে। মহিলা একে একে সব পোশাক খুলে ফেললেন। সমস্ত পোশাক ঘরের এদিকে ওদিকে অবহেলায় ছুঁড়ে ছুঁড়ে ছড়িয়ে দিলেন, তারপর সম্পূর্ণ নিরাভরণ অবস্থায় অনেকটা ব্যালে নাচের মতো করে ঘরের এক দিক থেকে আর একদিকে বার কয়েক যাওয়া-আসা করলেন। সেই যাওয়া-আসার সময় তাঁর মাথার চুল উড়ে উড়ে নগেনের মুখে এসে ঝাপটা লাগল। নগেন এক সময় ভয়ে, লজ্জায়, চোখ বুজিয়ে ফেলেছিল। কী আশ্চর্য! নগেন কি তাহলে অদৃশ্য! অদৃশ্য কথাটা মনে হতেই নগেন সাহস করে চোখ খুলল। আর চোখ খুলেই দেখল মহিলা বিছানার ওপর দাঁড়িয়ে সেই ছেড়ে-রাখা রেশমের পেটিকোটটা পরছেন, গলায় দুলছে একটা ফুলের মালা। কিন্তু এ কি! এ মহিলাকে তো সে চেনে! অনেক দিন না দেখলে কি হবে! এই তো তার ফুলা। ফুলা এত সুন্দর হয়েছে! নগেন 'ফুলা' বলে ডাকতেই চারদিক থেকে কারা যেন হো হো করে হেসে উঠল।

হাসির প্রচণ্ড শব্দে নগেনের ঘুম ভেঙে গেল। ঘর সম্পূর্ণ অন্ধকার। তবে অন্ধকার অনেক তরল হয়ে এসেছে। বোধহয় একটু পরেই ভোর হবে। ঘরে একটা জোনাকি ঢুকেছে। চারদিকে এলোমেলো উড়তে উড়তে আরশির উপর গিয়ে বসেছে। কাছাকাছি কোনো একটা বাড়িতে কার কোলের ছেলে ককিয়ে ককিয়ে কাঁদছে। স্বপ্নটা এত জীবন্ত! চোখ খুলে বাস্তব জগতে ফিরে আসতে নগেনের বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল। একটু সামলে নেবার পর নগেন প্রথমেই অনুভব করল, সে কিছু না পরেই শুয়েছিল। মাথায় যে তোয়ালেটা জড়ানো ছিল, সেটা দলা-পাকিয়ে বালিশের একপাশে পড়ে আছে। মাথার উপর পাখাটা বনবন করে ঘুরছে।

নগেন বিছানায় উঠে বসল। তোয়ালেটা বালিশের পাশে থেকে তুলে নিয়ে খাট থেকে নেমে দাঁড়াল। প্রথমেই সে তোয়ালেটা কোমরে

জড়িয়ে নিয়ে নিজের নগ্নতাকে ঢাকল। পাখার হাওয়া শীত শীত লাগছে বলে পাখাটা আগে বন্ধ করল। একবার বাথরুমে যেতে হবে। আলো জ্বেলে অন্ধকারকে আর বিব্রত করল না। আলো না থাকলেও সব কিছু সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

এই রকম একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখার কারণ কি? এ কি কোনোরকম একটা মনস্তাত্ত্বিক বিকার! ভাবতে ভাবতে নগেন ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় আবার ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙল প্রচণ্ড জলের শব্দে। পুব দিকের জানলা দিয়ে সূর্যের কিরণ তেরছা হয়ে ঘরের মেঝেতে পড়ে খাটের তলা অবধি গড়িয়ে গেছে। নগেন ধড়মড় করে উঠে বসল। এত প্রচণ্ড জলের শব্দ কোথা থেকে আসছে! নগেন কান পেতে শুনল, শব্দটা আসছে বাথরুম থেকে। শেষ রাতে যখন বাথরুমে গিয়েছিল তখন বোধহয় কলটা খুলে রেখে এসেছিল। ভোরে জল এসেছে, সেই জল এতক্ষণ ধরে পড়ছে। নগেন তাড়াতাড়ি গিয়ে কলের মুখটা বন্ধ করল। বাথরুমের সামনে একটা নরম লম্বা পাপোশ পাতা থাকে। পাপোশটা কি রকম এলোমেলো হয়ে কুঁচকে আছে। কি করে এরকম হল! নগেনের মাথায় এল না। এ সব ব্যাপারে সে ভীষণ খুঁতখুঁতে। যতই ঘুমচোখে উঠে বাথরুমে যাক, পাপোশটার এই অবস্থা সে নিজে করেছে বলে মনে হল না। কলের মুখটাও কী সে খুলে রেখেছিল!

বিন্দু নগেনদের বাড়িতে প্রায় একযুগ ধরে কাজ করছে। প্রায় ঘরের লোক হয়ে গেছে। মধ্যবয়সী নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ। যৌবনে বিয়ে হয়েছিল বোধহয়। নিজের ঘরসংসার আর করতে হয়নি। অন্যের ঘর সামলেই জীবন কাটিয়ে দিল। নগেন যা দেয় তাইতেই তার একার জীবন মোটামুটি চলে যায়। মল্লিকার সময় সে রাতেও এই বাড়িতে থাকত। মল্লিকা চলে যাবার পর নগেনই রাতে থাকতে নিষেধ করে দিয়েছে। বিন্দুর যৌবন যাই যাই করেও এখনও শরীরে আটকে আছে। বলা যায় না রাতে নগেনের বাড়িতে থাকলে পাঁচ কথা উঠতে পারে। বিন্দু বেশ গুছিয়েই ঘরসংসার করে। নিজের লোকও বোধহয় এত

সামাল দিয়ে চলতে পারত না।

সকালের চা নগেন বরাবরই একটু বেশি খায়। কাপে কুলোয় না বলে বিন্দু গেলাসেই চা রেখে গেল। বিন্দু পিছন ফিরে চলে যাচ্ছিল, নগেন তাকিয়ে দেখল শাড়ির পেছন দিকটা ছেঁড়া। ছেঁড়া শাড়ি পরেছে কেন? শাড়ি নেই নাকি?

'বিন্দু, শোন!'

বিন্দু যেতে যেতে ফিরে এল। 'কি বলছেন?'

'তোমার শাড়ি নেই?'

বিন্দু মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

'বুঝেছি, যাও।' বিন্দু জড়োসড়ো হয়ে চলে গেল পাশ কাটিয়ে। শাড়ির ছেড়া দিকটা যে পিছনে পড়েছে তা খেয়াল করেনি। ছি ছি!

নগেন চা খেতে খেতে ঠিক করল, মল্লিকার বহু আটপৌরে শাড়ি আলমারিতে পড়ে আছে, তার থেকে বেছে খান দুয়েক বিন্দুকে দিয়ে দেবে। কাগজওয়ালা জানলা দিয়ে খবরের কাগজটা আচমকা ফেলায় নগেন চমকে উঠেছিল। কাগজটা মেঝেতে যেমন পড়েছিল সেই ভাবেই পড়ে থাকল। কাগজটা তোলায় নগেনের তেমন কোনো উৎসাহ দেখা গেল না। সে ভাবছিল, ফুলা যদি সকালেই এসে যায় ভাল হয়। তা হলে ফুলাকে বিন্দুর জিম্মা করে দিয়ে সে একটু নিশ্চিন্তে অফিসে যেতে পারে। ফুলা এলে সকালেই আসা উচিত। যত বেলা বাড়বে, রোদ চড়বে। তার নিজেরই কষ্ট। বেশি রাতেও আসা উচিত নয়। দিন-কাল খুবই খারাপ। চা খাবার পর নগেন অন্যান্য দিন হয় একটু কাগজ পড়ে, না হয় দাড়ি কামাতে বসে। আজকে সে কাপড়ের আলমারি খুলে বসল। আলমারিটা অনেকদিন খোলা হয়নি। খুলতেই কেমন একটা ঠাণ্ডা হাওয়া বেরিয়ে গেল। নগেন আলমারিতে ওডোরমা দিয়ে রেখেছিল, জেসমিন, কি রোজ যা হয় একটা কিছু হবে। সেই গন্ধটাও সারা আলমারিতে কাপড়-জামার সঙ্গে জড়াজড়ি করে ছিল। নগেন বেছে বেছে খান কয়েক ডুরে শাড়ি বের করল। এ শাড়িগুলো

মল্লিকা নিজে পছন্দ করে কিনেছিল। নগেন আর একটা শাড়ি খুঁজে খুঁজে বের করল। সে শাড়িটা বেশ মিহি, কচি কলাপাতা রঙের। কোনো একটা বিবাহ-বার্ষিকীতে নগেন নিজে পছন্দ করে কিনে এনেছিল। মিহি শাড়িটা সে ফুলাকে দেবে বলে বের করল। এত শাড়ি জমিয়ে রেখে লাভ কি! সবই তো ভাঁজে ভাঁজে লাট খেয়ে যাবে। ফুলা এলে আরো কয়েকটা শাড়ি সে ফুলাকে পছন্দ করে নিতে বলবে।

নগেন আলমারি বন্ধ করে বিন্দুকে ডাকল। বিন্দু তখন রান্নায় ব্যস্ত ছিল। আঁচলে হাত মুছতে মুছতে দৌড়ে এল, 'কিছু বলছেন দাদাবাবু?'

'শোন, ছেঁড়া কাপড় আর পরবে না, এই নাও, দুখানা শাড়িতে আপাতত চালাও, পরে আরো কয়েকটা পাবে।'

বিন্দু শাড়ি দুখানা হাত পেতে নিতে একটু ইতস্তত করল। বিন্দু জানে, এ শাড়ি মল্লিকার। সে বৌদিকে এই শাড়ি পরে বহুদিন দেখেছে। এখনও চোখ বুজলে সে মল্লিকাকে যেন চোখের সামনে দেখতে পায়। বিন্দুর সংস্কার মাথা তুলে দাঁড়াল।

'বৌদির শাড়ি আমি পরব দাদাবাবু! এ আমি পারব না।'

'তুমি ভুল করছ বিন্দু। শাড়ি, শাড়ি। শাড়িগুলোকে আলমারিতে পচিয়ে কোনো লাভ আছে! তুমি বেশ ভালই জান এ বাড়িতে তুমি ছাড়া শাড়ি পরার আর দ্বিতীয় কোনো লোক নেই। আমি তোমাকে নতুন কিনে দিতে পারতুম, কিন্তু এত শাড়ি নষ্ট হবে!' নগেন শাড়ি দুটো বিন্দুর অনিচ্ছুক হাতে ধরিয়ে দিল। প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক মানুষের অবচেতনায় অদ্ভুত এক জটিলতার সৃষ্টি করে রাখে। যতই আপন জন করে নেবার চেষ্টা কর বারে বারেই সম্পর্কের মাঝখানে একটা সঙ্কোচের পাঁচিল তৈরি হয়।

বিন্দু শাড়ি দুটো বুকে চেপে ধরে কিছু সময় দাঁড়িয়ে রইল, তারপর চলে যাবার আগে নগেনকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি আর একটু চা খাবেন?' নগেন সকালে যতক্ষণ বাড়ি থাকে সেই সময় সে বার

কতক চা খায়। চা খেতে তার ভালো লাগে। বিন্দুর প্রস্তাবে সে না করতে পারল না। যদিও এই একটু আগে চা খেয়েছে। টেবিলে এখনও খালি গেলাস পড়ে আছে। বিন্দু ইতিমধ্যেই শাড়ির ছেঁড়া দিকটা ঘুরিয়ে পরে নিয়েছে। এবার তাকে পাশে হেঁটে নগেনের সামনে থেকে সরে যেতে হল না।

সারাটা সকাল নগেন ফুলার জন্যে অপেক্ষা করে রইল। ফুলা কিন্তু এল না। আর দেরি করলে অফিস যাওয়ার কোনো মানে হয় না ভেবে, নগেন বিন্দুকে সব বলে, ফুলা এলে কি করতে হবে সব জানিয়ে অফিস যাবার জন্যে বেরিয়ে পড়ল। সারাটা পথ যেতে যেতে সে শুধু ফুলার কথা ভাবল, যদি রাস্তায় দেখা হয়ে যায়। কিন্তু না, পথে দেখা হল না। ফুলার কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই। সকালে এলে কি ক্ষতি হত!

নগেন মোড় থেকে বাসে উঠে পড়ল। বাসে বসে বারে বারে তার শেষ রাতের স্বপ্নটাই মনে পড়ল। কেন সে ফুলাকে স্বপ্ন দেখল! ফুলার চিঠিটা পড়ে, সে কি ফুলার কথা ভাবছিল। হতে পারে মন এমন একটা দুরন্ত বস্তু, কখন সে কোন পথে ছোটে! হঠাৎ ফুলার চিন্তা ভুলে উল্কার কথা মনে এল। উল্কা এখন হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে কি করছে কে জানে? এমন একটা সকাল, পুজো প্রায় এসে গেল, নতুন জামা পরে কেমন প্রজাপতির মতো ছুটবে বাগানে গাছের ফাঁকে ফাঁকে। তার বদলে হাসপাতালে আবদ্ধ!

নগেন অফিসে মোটামুটি একটা সম্মানজনক পদে প্রতিষ্ঠিত। তার অধীনে আরও অনেকে কাজ করেন। শমিতা তাদের মধ্যে একজন। মেয়েটি সবে কাজে যোগ দিলেও বেশ বুদ্ধিমতী এবং কাজের মেয়ে। কাজকে সে ভয় পায় না। বয়স বেশী নয় কিন্তু সব সময়েই বিষণ্ণ করুণ, নগেনের ধারণা সাংসারিক জীবনে শমিতা সুখী নয়। পৃথিবী থেকে সুখ বস্তুটা কি উধাও হয়ে গেল! মানুষ আছে, সভ্যতা আছে, ভোগ আছে, নেই কেবল সুখ। ইদানীং নগেন লক্ষ্য করে দেখে প্রতিটি মানুষ কেমন যেন বিমর্ষ! সবই করছে অভ্যাসে। কোথাও যেন প্রাণের যোগ

নেই। সব জীবনই যেন কেমন শুকিয়ে আসছে।

অফিসে আসার পর থেকেই নগেন বড় একটা ফিগার ওয়ার্ক নিয়ে পড়েছে। এসব কাজ নগেন অন্যদিন নিমেষে করে ফেলে। আজকে যে কি হয়েছে; বারে বারে চেষ্টা করেও মেলাতে পারছে না। শেষে বিরক্ত হয়ে শমিতাকে ডেকে বলল, দেখ তো কি হয়েছে। আমার আজ আর মাথা চলছে না, ততক্ষণ বুদ্ধির গোড়ায় একটু ধোঁয়া দি। শমিতা মৃদু হেসে নগেনের টেবিল থেকে দম-দেয়া পুতুলের মত ভঙ্গী করে কাগজগুলো তুলে নিয়ে গেল। শমিতাকে নগেন আজ পর্যন্ত প্রাণখুলে একটু হাসতে দেখেনি। কিছু বলার নেই, যার যেমন অভ্যাস!

নগেন বেশ আয়েস করে একটা সিগারেট ধরিয়ে চায়ের অর্ডার দিল। শমিতা চা খাবে কিনা জিজ্ঞেস না করে তার জন্যেও এককাপ আনতে দিল। নগেন জানে জিজ্ঞেস করলেও শমিতা কখনই হ্যাঁ বলবে না। তার চেয়ে এক কাপ চা আনিয়ে তার সামনে ধরে দিলে না খেয়ে পারবে না। নগেন একটা জিনিস ভেবে অবাক হল, হঠাৎ সে এত বেশি ফুলার কথা ভাবছে কেন! ভোরের স্বপ্ন? ফুলার চিঠি! না অন্য কোনো কারণ! অন্য কারণ আর কি হতে পারে! শমিতা কাগজপত্র নিয়ে অনেকক্ষণ টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। নগেনকে চিন্তামগ্ন দেখে কিছু বলতে সাহস পায়নি। নগেনের চা এদিকে প্রায় জুড়িয়ে জল। শমিতা সাহস করে ডাকল, 'নগেনদা আপনার চা।' নগেন চমকে উঠল, 'ও চা দিয়ে গেছে। তোমার টোটালটা হয়ে গেছে, দাও দাও।' নগেন হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপ বাঁচিয়ে শমিতার হাত থেকে বড় বড় কাগজের সিটগুলো নিজের দিকে টেনে নিতে নিতে বলল, 'তুমি চা খেয়েছো!' শমিতা উত্তরে মাথা নাড়ল। নগেন বলল, 'ঠিক আছে এখন আর কিছু করার নেই, তুমি বস, এইবার আমি সব করে নিতে পারব।' শমিতা আস্তে আস্তে তার আসনে ফিরে গেল। শমিতার মধ্যে একটা অদ্ভুত ধীর স্থির ভাব আছে, যা নগেন অন্য কোনো মহিলার মধ্যে সাধারণত দেখেনি। অফিসে আরো অনেক মহিলা আছেন, যাঁদের চপলতায়

অফিস সারা দিনই মুখর। শমিতাই একমাত্র ব্যতিক্রম।

চা-টা একচুমুকে শেষ করে নগেন সবে কাগজগুলো টেনে নিয়ে বসতে যাচ্ছে ঠিক সেই সময় বিনু এল। নগেন বিনুকে লক্ষ্য করেনি। বিনু একেবারে টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে 'জামাইবাবু' বলে ডাকতে সে অবাক হয়ে মুখ তুলে তাকাল। 'বিনু তুমি'!

বিনু চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে বলল, 'আপনার সঙ্গে ভীষণ দরকার।'

'আমার সঙ্গে!' নগেন বেয়ারাকে ডেকে দুকাপ চা দিতে বলে কাগজপত্র ভাঁজ করে রাখল। বিনু বলল, 'হাঁ আপনার সঙ্গে।' অনেক-দিন পরে নগেন বিনুকে দেখছে। আগের চেয়ে স্বাস্থ্য অনেক ভালো হয়েছে। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া বড় বড় চুলে বিনুকে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল। বিনুর মুখটা একটু মেয়েলী ধরনের, বেশ মিষ্টি। নগেনের সঙ্গে বিনুর কি প্রয়োজন থাকতে পারে? নগেনতো শ্বশুর বাড়ির কোনো ব্যাপারেই কখনও মাথা ঘামায়নি। বিনু শেষ চুমুক দিয়ে চায়ের পেয়ালাটা নামিয়ে রাখতেই নগেন জিজ্ঞেস করল, 'বল, কি বলছিলে?' বিনু চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'এত লোকের সামনে বলা যাবে না। বাইরে কোথাও চলুন না।'

নগেন একটু অবাক হল, কি এমন ব্যাপার যে অফিসে বসে বলা যায় না। নগেন চেয়ারটা আস্তে ঠেলে উঠে দাঁড়াল, 'ঠিক আছে চলো আমাদের একটা রিক্রিয়েশন ক্লাব আছে, এখন সেখানে কেউ থাকবে না, চল সেখানে বসেই কথা বলা যাবে।' নগেনকে অনুসরণ করে বিনু অফিস থেকে বেরিয়ে এল। নগেন বেরোবার সময় শমিতাকে বলে এল, সে এখনি আসছে।

ক্লাবে এ সময়ে কেউই থাকে না। ভিড় আরম্ভ হবে আর একটু পরে। ঘরের মাঝখানে বিলিয়ার্ড টেবিল, একটা ফেল্টের চাদরে ঢাকা কোণে অনেক দূরে টেবিল টেনিসের টেবিল পাতা। ঘরের আর একপাশে মাদুর ঢাকা একটা চৌকির উপর ক্যারামবোর্ড। নগেন আর বিনু সেই

চৌকির উপর বোর্ডটাকে একপাশে সরিয়ে রেখে সাবধানে বসল, 'বল কি বলছিলে ?'

বিনু প্রথমে একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল, 'ফুলা কি আপনাকে চিঠি লিখেছিল ?'

'হ্যাঁ, কেন বল তো ?'

বিনু কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। আঙুল দিয়ে ক্যারামবোর্ডের উপর আস্তে আস্তে শব্দ করল কয়েকবার। তারপর খুব মৃদু গলায় বলল, 'ফুলা খুব অসুস্থ।'

'অসুস্থ মানে। তার তো আজ আমাদের বাড়িতে আসার কথা! আমি ভেবেছিলুম সকালেই আসবে।'

'ফুলার আর কোথাও যাবার মতো অবস্থা নেই।'

'সে কি! আমাকে চিঠিতে লিখেছে, সামনে পরীক্ষা, একটু নির্জনে লেখাপড়া করার জন্যে আমাদের ওখানে আসবে। কি হয়েছে ফুলার ?'

বিনু এবারেও চুপ করে রইল, যেন কি একটা বলতে চায় অথচ বলতে পারছে না। শেষে একসময় বলল, 'ফুলার মাথাটা কি রকম গোলমাল হয়ে গেছে। আবোলতাবোল কথা বলছে। যাকে-তাকে যা-তা বলছে। একদম ঘুমোতে পারছে না। সারারাত জেগে থাকে। কখনও গান গায়, কখনও আবৃত্তি করে। সব সময় সেজেগুজে থাকে। আপন মনে হাসে। আর মাকে দেখলেই ভীষণ রেগে যাচ্ছে। মাকে একদম সহ্য করতে পারছে না।'

'কি আশ্চর্য! এ রকম হবার কারণ ?'

'কারণটা তো আমরাও বুঝতে পারছি না, হঠাৎ এই রকম হল।'

'কি করবে ভেবেছো, কাকে দেখাচ্ছ ?'

'এখনও দেখানো হয়নি। আমরা প্রথমটা তো ব্যাপারটা বিশ্বাস করতেই চাইনি। এখন দেখছি ফুলা আর স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। তবে একটা ব্যাপার, অনবরতই সে আপনাকে দেখতে চাইছে, কেবল আপনার কথা বলছে।'

'আশ্চর্য! আমার সঙ্গে শেষ তার কবে দেখা হয়েছে মনে পড়ে না। এক বছরও হতে পারে, দু বছরও হতে পারে। অথচ আমার কথা বলছে।'

'আমার মনে হয়, আপনি যদি আজ একবার আসেন বড় ভাল হয়, আপনার সঙ্গে পরামর্শ করে তারপর যা হয় একটা কিছু করা যাবে।'

'কেন তোমার দাদা?' নগেন প্রশ্নটা হঠাৎই করে ফেলল। হয়ত বিনুকে একটু আঘাত দেবার ইচ্ছে ছিল। শ্বশুরবাড়ির কোনো ব্যাপারেই নগেনকে কখনও কোনো কথা কেউ জিজ্ঞেস করেনি। মল্লিকাকে পার করে দিয়ে সকলেই নিশ্চিন্ত ছিল। নগেন যে বাড়ির বড় জামাই, তারও যে একটা প্রাপ্য সম্মান থাকতে পারে, শ্বশুরবাড়ির কারুর মাথায় এ কথা কখনও ঢোকেনি।

বিনু এবারে খুবই বিব্রতের মতো মুখ করে বসে রইল। বিনুর মুখ দেখে নগেনের মনটা খারাপ হল। নিজের উপরেই রাগ হল, কি দরকার ছিল প্রশ্নটা করার! বিনু কিন্তু উত্তর দিল, 'দাদা আজ মাসখানেক হল আলাদা হয়ে গেছে। আলাদা বাড়ি ভাড়া করে উঠে গেছে। আমরা এখন খুবই অসুবিধের মধ্যে আছি।'

নগেন এতটা আশা করেনি। সমীরণ প্রথম থেকেই একটু অন্য রকমের ছিল, তবে একেবারে আলাদা হয়ে যাবে ভাবেনি। বিনু উঠে দাঁড়াল। সোজা হয়ে দাঁড়ালে বিনুকে বেশ লম্বা দেখায়। 'তাহলে আজকে আপনি সন্ধ্যের পর আসছেন বলে ধরে নিতে পারি'—বিনু যেতে যেতে বলল।

নগেন বলল, 'নিশ্চয়ই, হাসপাতাল থেকে বেরিয়েই তোমাদের ওখানে চলে যাব।'

বিনু তিনটে নাগাদ চলে গেল। নগেন আরো দেড় ঘণ্টা পরে অফিস থেকে বেরোবে। অফিসে সকলেই তাকে শ্রদ্ধা করে তার নিষ্কলুষ চরিত্রের জন্যে, তার সহজ সুন্দর আন্তরিক ব্যবহারের জন্যে। অফিসের চেয়ারে ফিরে এসে নগেন কিছুতেই আর কাজে মন বসাতে পারল না।

শমিতাকে ডেকে বলল, 'আজ আমার মনটা ভীষণ চঞ্চল হয়ে আছে, কিছুই করতে পারছি না, যা পার তুমি কর,কোনো রকমে চালিয়েনাও।'

শমিতা হয়ত কোন প্রশ্ন করত কিন্তু ভীষণ ভদ্র মেয়ে, কারুর ব্যক্তিগত ব্যাপারে কৌতূহল প্রকাশ করা অশোভন ভেবেই চুপ করে রইল। শুধু চোখে রইল একটা প্রশ্ন, একটা আশ্বাস, তাতে কি হয়েছে, আমরা তো রয়েছি। শমিতা ধীরে ধীরে নগেনের টেবিল থেকে সমস্ত কাগজ সরিয়ে নিয়ে চলে গেল।

পরপর দু কাপ চা খেয়েও নগেন ফুলার ব্যাপারটার কোন কূল-কিনারা করতে পারল না। ফুলার কি এমন হল যে সে মানসিক স্থিতি-সাম্য হারিয়ে ফেলল! কি এমন আঘাত! কোনো প্রেম! প্রেম কথাটা মনে হতেই নগেনের মনে পড়ল, সে যেন অনেকদিন আগে রেস-কোর্সের কাছে ফুলার মত কাকে একটা স্বাস্থ্যবান ছেলের স্কুটারের পেছনে বসে যেতে দেখেছিল। মেয়েটি ছেলেটির কোমর দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছিল। ছেলেটি খুব জোরে স্কুটার চালাচ্ছিল আর গান গাইছিল। নগেন তখন অতটা গ্রাহ্য করেনি। ফুলা তো ফুলা, তাতে নগেনের কি যায় আসে। এখন মনে হচ্ছে সেই জোয়ান হিপি-চুল স্ফূর্তিবাজ ছেলেটাই ফুলার বর্তমান অবস্থার কারণ নয় তো? বলা যায় না আজকালকার ছেলেমেয়েদের 'ফ্রি-মিক্সিং' সব সময়ে ভাল ফল দেয় না। কিন্তু বারে বারে নগেনের নাম করার কি কারণ! কে জানে, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়! নগেনের মনে হল সে যেন ক্রমশই নানা ঘটনায় জড়িয়ে পড়ছে। সেই বাঘের অবস্থা। বনের পথে যেতে যেতে আঠা-মাখানো পাতায় পা আটকে গেল, সেই একটা পা ছাড়তে গিয়ে আর একটা পা গেল, শেষে পাতায় গড়াগড়ি, সারা গায়ে পাতা, বাঘমশাই বন্দী।

নগেন অন্যান্য দিনের চেয়ে কিছু আগেই বেরিয়ে পড়ল। উল্কার কাছে যাবার আগে কিছু কেনাকাটা করতে হবে। বেশ ভাল বিস্কুট কোনো বড় দোকান থেকে আজ তাকে কিনতেই হবে। চুল বাঁধার ফিতে কিনতে

হবে। একটা পাউডার কেনা দরকার। ভাল সন্দেশ কিনতে হবে। নগেন মনে মনে একটা লিস্ট তৈরি করে রাস্তায় নেমে পড়ল। সারাদিনই আজ আকাশ পরিষ্কার। মেঘ ভাসছে এখানে ওখানে, ছেঁড়া ছেঁড়া, ছাড়া ছাড়া।

ধর্মতলার কাছাকাছি এসে নগেন দেখল একটা বড় মিছিল বেরিয়েছে। মহিলাদের মিছিল। সুদূর গ্রাম থেকে মহিলারা শহরে এসেছেন মিছিল করে প্রতিবাদ জানাতে। কোনো কোনো মহিলার কোলে শীর্ণ সন্তান। এরা বেঁচে থাকতে চায়। বেঁচে থাকাও কি কষ্টের, কি সমস্যার! মিছিলটার জন্যে নগেনকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে থাকতে হল। মিছিল যাঁরা পরিচালনা করছেন তাঁদের সাজপোশাক ওরই মধ্যে বেশ ভাল, চেহারা শহুরে ধোপ-দুরস্ত। নগেনের হাসতে ইচ্ছে করল, রাজনীতিও কিছু মানুষের এক ধরনের ব্যবসা, বেঁচে থাকার ধরন। এক একটা কারণ ধরে কিছু মানুষকে ছাগলের মতো তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ানো। এতে মিছিলের মানুষদের কি উপকার হয় জানা নেই তবে মিছিল যাঁরা তৈরি করেন তাঁদের অবশ্যই কিছু হয়।

নগেন রাস্তা পার হবার আশা ছেড়ে, মিছিলের সমান্তরালে হাঁটতে শুরু করল। মিছিলে চলতে চলতে একটি ছোট মেয়ে অনবরতই তার মাকে বিরক্ত করছে, জল খাব, জল খাব। মেয়েটির মা শুনেও শুনছে না, নির্বিকার হেঁটে চলেছে, যেন নেশাগ্রস্ত। শিশুদের কষ্ট নগেন সহ্য করতে পারে না। শিশু কেন, যে কোনো মানুষের কষ্ট দেখলেই নগেনের হৃদয় কাঁদে। মনের খাঁজে খাঁজে জল জমে ওঠে। নগেনের একবার খুব ইচ্ছে হল মেয়েটিকে একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস কিনে দেয়। কিন্তু উপায় নেই, মিছিল চলতেই থাকে, মিছিল থামে না।

নগেন ভেবেছিল সে বেশ সকাল সকালই হাসপাতালে পৌঁছতে পারবে; কিন্তু মিছিলের জন্যে সেই দেরি হয়ে গেল। ভিজিটিং আওয়ার্স শুরু হয়ে যাবার প্রায় মিনিট পনের পরে নগেন হাসপাতালে ঢুকলো।

বুকের কাছে একগাদা প্যাকেট। রুক্ষ চুল কপালের কাছে হাওয়ায় ছুলছে। গালের পাশ দিয়ে ঘামের ফোঁটা নামছে। মুখটা মোছবার উপায় নেই, ছুটো হাতই জোড়া।

উল্কার অবস্থার কোনো পরিবর্তন নগেনের চোখে পড়ল না, পড়ার কথাও নয়। যা হবার তা সকলের চোখের অন্তরালে উল্কার ছুই জানুর মধ্যে হচ্ছে। ধীরে ধীরে হাতের পুড়ে যাওয়া বিকৃত আঙুলগুলোয় মাংস ধরছে। অদৃশ্য কোনো মৃৎশিল্পী যেন প্রতিমার কাঠামোয় একটু একটু করে মৃত্তিকার প্রলেপ দিয়ে চাঁপার কলি আঙুল তৈরি করে চলেছে। একদিন হাতের পাতা ছুটো যখন সহসা মুক্তি পাবে তখন নগেন অবাক হয়ে যাবে, দশটি শ্বেত চাঁপার খেলা চলবে তার চোখের সামনে।

উল্কার মাথার সামনে টাঙানো জ্বরের চার্টটার উপর নগেন একবার চোখ বুলিয়ে নিল। সকালে নর্মাল, ছুপুরে সামান্য একটু থাকছে, আবার রাতে নর্মাল হয়ে যাচ্ছে। ছুপুরে রোদের উত্তাপে, শরীরের মধ্যে অস্বস্তিকর ভাবে ছুটো হাত ঢুকে থাকার ফলেই বোধ হয় শরীরের তাপ সামান্য বাড়ছে।

নগেন উল্কার পাশে বসে একটা বিস্কুট খাওয়াবার চেষ্টা করল, 'অনেক দিন তোমাকে নিজের হাতে কিছু খাওয়াইনি। একটা বিস্কুট তোমাকে আজ খেতেই হবে।'

উল্কা মৃছু হাসল। হাসলে তাকে সুন্দর দেখায়, গালে ছোট্ট একটা টোল পড়ে। সিস্টার উল্কাকে আজ সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছেন। কপালে ছোট্ট একটা কুম্‌কুমের টিপ। মাথার সামনে একটা নীল রিবনের ফুল। চুল শ্যাম্পু করা হয়েছে। রেশমের মতো নরম, ফুর ফুর করে উড়ছে। একটা ওষুধ ওষুধ গন্ধ নাকে লাগছে। নগেনের হাত থেকে উল্কা আস্তে আস্তে একটা বিস্কুট, একটা সন্দেশ খেল। ফিডিং কাপ থেকে একটু জল।

এতক্ষণ সিস্টার বোধহয় অন্য কোথাও কাজে ব্যস্ত ছিলেন। ছুটতে ছুটতে এলেন। মুখে সেই অঢেল হাসি। 'কেমন দেখছেন মেয়েকে?'

নগেন না হেসে পারল না, 'বেশ ভালই দেখছি, আপনি সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছেন, তবে এই শুয়ে থাকার কষ্টটা তো আমরা কেড়ে নিতে পারব না।'

সিস্টার উল্কার মাথার সামনে খাটের বাজুতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন, একটা হাত উল্কার চুলে খেলা করছে, 'সে তো ঠিকই, এই চিকিৎসার এই বড় কষ্ট। তবে কি করা যাবে বলুন, ভাগ্য।'

'ভাগ্য আপনি মানেন?'

'মানি না আবার? আমার নিজের জীবনটাই তো ভাগ্যের খেলা।' সিস্টার কথাটা বলেই কেমন যেন রহস্যময় নীরবতার মধ্যে চলে গেলেন। বোঝা গেল জীবনের কোথাও একটা প্রচণ্ড আঘাতের ক্ষতকে ভোলার চেষ্টা করেও ভুলতে পারছেন না। সব সময় কাজ আর হাসি দিয়ে একটা আবরণ সৃষ্টি করে রাখতে চাইছেন।

নগেন প্রসঙ্গ পাল্টে নিল, 'আমার সময়টা গত এক বছর থেকে মোটেই ভাল যাচ্ছে না, একটার পর একটা বিপদ আসছে, মাঝে মাঝে মনের বল হারিয়ে ফেলছি।'

সিস্টার উল্কার মাথা থেকে হাতটা তুলে নিয়ে ইশারায় নগেনকে উল্কার থেকে কিছু দূরে জানলার পাশে ডেকে নিলেন, তারপর খুব ফিস ফিস করে বললেন, 'মা মারা যাবার পর ছোট ছেলেমেয়েদের এই রকম বিপদ যায়, তখন খুব সাবধানে রাখতে হয়। মায়েরা অন্য জগতে গিয়েও নিজের ছেলেমেয়েকে কাছে টেনে নিতে চায়।' কথাটা শুনে নগেন খুব অবাক হল। তার মানে মল্লিকা উল্কাকে নিয়ে যেতে চেয়ে ছিল। মল্লিকা এত নিষ্ঠুর! বিদেহী আত্মারা তো অনেক সময় ভালও করে সে শুনেছে, অনেক বিপদ থেকে বাঁচিয়েও দেয়, তবে....'

নগেনকে চুপ করে থাকতে দেখে সিস্টার হেসে ফেললেন, 'এ সব আমাদের মেয়েলী সংস্কার, আপনারা বিশ্বাস করবেন না, বিশেষত এই বিজ্ঞানের যুগে। তবে আমার এই এতদিনের দীর্ঘ চাকরি জীবনে আমি অনেক কেস দেখেছি এবং তাতে আমার বিশ্বাস আরো পাকা হয়েছে।'

নগেন বলল, 'আমার চুপ করে থাকার কারণ অন্য। আমি ভাবছি মেয়েরা এত নিষ্ঠুর হয় কি করে?'

'নিষ্ঠুর বলছেন কেন, এটা হল অপত্য স্নেহ, ভালবাসার জিনিসকে তারা ছেড়ে থাকতে পারে না, কি ইহলোকে, কি পরলোকে।'

নগেন হাসল, 'জীবন বড় জটিল জিনিস, মৃত্যু আবার তেমনি রহস্যময়। কোনোটাই ভাল করে বোঝা যায় না। আপনারা তবু কিছুটা বোঝেন। আমরা তো গা বাঁচিয়ে জীবনের একপাশ দিয়ে হেঁটে গেলাম, মৃত্যুতে কি আছে সে তো পরের কথা।'

সিস্টার বললেন, 'থাক, আর তত্ত্ব কথায় কাজ নেই, এখন চলুন চা খাই, কাজের কথা আছে।' নগেনের চা খাবার খুব একটা ইচ্ছে ছিল না; কিন্তু কেউ কিছু অনুরোধ করলে সে ঠেলতে পারে না। নগেন এও বোঝে না হাসপাতালে এত দর্শনার্থী আসে, অনেকেই কর্মীদের উদাসীন ব্যবহার সম্পর্কে অভিযোগ করেন, অথচ নগেনের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ অন্যরকম, দিনের পর দিন সিস্টারের হাতে তৈরী চা খেয়ে সে বিদায় নেয়। একেই বলে ভাগ্য। কার ভাগ্য! তার নিজের, না উল্কার।

চা খেতে খেতে সিস্টার বললেন, 'আপনার কাছে আমার একটা ব্যক্তিগত অনুরোধ আছে, বলুন রাখবেন?' নগেন এই ধরনের কথাকে ভীষণ ভয় পায়। মহিলাদের অনুরোধ কখন কোন দিক থেকে আসবে কি চেহারা নিয়ে, বলা শক্ত। না শুনে কথা দেওয়া মুশকিল। তবু নগেন বলল, 'বলুন না, সাধ্যে থাকলে অবশ্যই রাখব।' নগেনের দিকে একটা বিস্কুট এগিয়ে দিতে দিতে সিস্টার বললেন, 'আমার ছোট বোনটা এম. এ. পাস করে বসে আছে, ওকে একটা চাকরি করে দিতে হবে। আপনি চেষ্টা করলে অবশ্যই পারবেন।'

নগেন যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। খুব সাধারণ অনুরোধ। নগেন খুব শান্তভাবে নরম গলায় বলল, 'আপনার অনুরোধ, আমি নিশ্চয়ই রাখবার চেষ্টা করব, তবে চাকরির বাজার আপনি নিজেই জানেন, আগের মতো সহজ নেই, হয়ত একটু সময় লাগবে।'

সামান্য কথাতেই মানুষ কত খুশী হয়। কোথায় চাকরি, কোথায় কি। শুধু চেষ্টা করে দেখব বলাতেই সিস্টার কত উৎফুল্ল! তাঁর মুখ দেখে নগেনের মনে হল তিনি যেন পুব আকাশের দিকে তাকিয়ে সূর্যোদয় দেখছেন।

হাসপাতালের বাইরে এসে নগেন কিছু সময় ফুটপাথে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। উল্কাকে দেখতে আসাটা ইদানীং অভ্যাস হয়ে গেছে, কিন্তু এইবার শক্ত কাজ করতে হবে। ফুলাকে দেখতে যেতে হবে। প্রথম দুশ্চিন্তা মাঝপথ থেকে বাসে ওঠা। অফিসের ভিড় কাটতে কাটতে সেই রাত দশটা। নগেন একটা সিগারেট ধরিয়ে কার্যপদ্ধতি ঠিক করতে লাগল। প্রথম সমস্যাটার কি সমাধান হবে! কি ভাবে সে যাবে! অনেক ভেবে সে ঠিক করল একটা ট্যাক্সিই করবে। অনেক টাকার ব্যাপার। কিন্তু কি করা যাবে! একবার তার মনে হল, যদি না যায় তাহলে কেমন হয়। কিন্তু না, ফুলা সম্পর্কে তার একটা কৌতূহল রয়েছে। কেন সে ফুলাকে স্বপ্নে দেখল? কেন ফুলা তার কথা বারে বারে বলছে? কেন বিনু তার সঙ্গে ফুলা সম্পর্কে পরামর্শ করতে চাইছে?

অনেক কষ্টে নগেন একটা ট্যাক্সি পেল। এ অঞ্চলে সঙ্গে মহিলা না থাকলে ট্যাক্সি পাওয়া ভার। ট্যাক্সিটা কিছুদূর গিয়ে নগেনের বিনা অনুমতিতেই শাট্‌ল ট্যাক্সি হয়ে গেল। আরো কয়েকজন উঠে পড়লেন। সকলেই অপ্রকৃতিস্থ। বেসামাল হবার আগের অবস্থা। মানুষ আজকাল সহজেই নেশার শিকার। টাকার নেশা, তরলপদার্থের নেশা। নগেন কোনো রকমে সঙ্কুচিত হয়ে বসে পথটা কাটিয়ে দিল।

ফুলাদের নীচের তলার ভাড়াটেরা বোধহয় উঠে গেছে। একতলাটা অন্ধকার। সিঁড়িটাও অন্ধকার। উপরে কোথাও একটা আলো জ্বলছে। তার একটা আভা সিঁড়ির সবচেয়ে উপরের কয়েকটা ধাপে এসে পড়েছে।

নগেন ওপরে উঠে এসে, বিনু বিনু বলে কয়েকবার ডাকল। কোনো সাড়া পেল না। নগেন খুব বিপদে পড়ল। বিনু জানে সে আসবে অথচ কোথায় চলে গেল! নগেন আরো বার কয়েক ডাকল। কোনো সাড়া নেই। বাড়িতে কেউ আছে বলে মনে হল না। নগেন ভাবছে ফিরে যাবে, এমন সময় বিনু সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল, হাতে একট গেলাসে আধ গেলাসের মতো চা। বিনু সামনে এসে বললে, 'জামাইবাবু, কতক্ষণ এলেন আমি দোকানে চা কিনতে গিয়েছিলুম।' নগেন যেতে যেতে বললে, 'আমি এইমাত্র এসেছি, কারুকে না দেখে ফিরে যাচ্ছিলুম।'

নগেন বিনুর ঘরে এসে বসল। ঘরটা কেমন যেন শ্রীহীন। ময়লা বিছানার চাদর। চারদিকে বই আর কাগজ ছড়ানো। মেঝেতে ধুলো, সিগারেটের টুকরো ছড়ানো। নগেন একটা হাতলছাড়া চেয়ারে বসল। বিনু চায়ের গেলাসটা টেবিলে রেখে নগেনকে জিজ্ঞেস করল, 'একটু চা খাবেন? নগেনের চা তেষ্টা পেয়েছিল, পাছে বিনু বিব্রত হয় এই ভেবে বলল, 'না থাক, আমি এইমাত্র চা খেয়েছি।' বিনু আর দ্বিতীয়বার অনুরোধ না করে চায়ে চুমুক দিল। এ বাড়িটা নগেনের কাছে চিরকালই রহস্যময় রয়ে গেল। বিনু দোকান থেকে চা এনে খাচ্ছে। বিনুর মা কোথায়! ফুলা কোথায় গেল!

নগেনকে প্রশ্ন করতে হল না, বিনুই বললে। বিনুর মা সন্ধ্যের শোতে সিনেমা দেখতে গেছেন। ফুলা তার নিজের ঘরে দরজা দিয়ে বসে আছে। সেই বিকেলে একবার বেরিয়েছিল। তারপর থেকেই ঘরে বসে আছে। নগেন একটু ইতস্তত করে বলল, 'তাহলে আজকে আমি যাই কি বল?' বিনু হাত নেড়ে বলল, 'না না, আপনার সঙ্গে আমার দরকার আছে, আর আপনি ফুলাকে ডাকলে, আমার মনে হয় সে দরজা খুলে দেবে।' নগেন আরো কিছু সময় সেই হাতলহীন পালিশ-চটা চেয়ারে বসে রইল। বিনু চুমুকে চুমুকে চা প্রায় শেষ করে এনেছে। নগেন বলল, 'ঠিক আছে, তোমার চা খাওয়া হয়ে যাক, তুজনে এক সঙ্গেই যাব।' টেবিলের উপর থেকে সেদিনের কাগজটা তুলে নিয়ে নগেন পাতা ওলটাতে লাগল।

আজকালকার কাগজে খবর খুব বেশি থাকে না, থাকে অজস্র বিজ্ঞাপন। নগেন একটা কাপড়ের কলের বিজ্ঞাপন দেখছিল—একটি ছেলে অদ্ভুত একটা পোশাক পরে গাছের ডাল ধরে ঝুলছে, আর দূর থেকে একটি মেয়ে নেচে নেচে দু হাত প্রসারিত করে ছেলেটির দিকে এগিয়ে আসছে।

বিনুর চা শেষ হল, অল্প একটু তলানি পড়ে রইল গেলাসে। গেলাস-টার সারা গায়ে ছোপ ছোপ দাগ। নগেনের গা ঘিন ঘিন করে উঠল। এ বাড়ির সকলেই কি মৃত! জীবন সম্পর্কে সমস্ত উৎসাহই কি শুকিয়ে গেছে? বিনু বলল, 'চলুন তা হলে যাওয়া যাক।' ফুলার ঘর বারান্দার সব শেষে। সেই ঘরটা, যে ঘরে নগেন একদিন মল্লিকাকে অসুস্থ হয়ে একা শুয়ে থাকতে দেখেছিল। এ ঘরটা কি অসুখের ঘর। ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। কোনো সাড়া শব্দ নেই। বিনু দরজায় কান পেতে কিছু শোনা যায় কি না দেখল, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ভারি গলায় ডাকল, 'ফুলা'। দু তিনবার ডাকার পর ঘরের মধ্যে চুড়ির শব্দ হল; কিন্তু দরজা খোলার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না।

তখন নগেন ডাকল, 'ফুলা, দরজা খোল, আমি এসেছি, আমি নগেন এসেছি।' ঘরে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। বিনু আর নগেন সোজা হয়ে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। ফুলা বন্ধ ঘর থেকে বললে, 'দরজা আমি খুলব, তবে একজনের জন্যে, ওই শয়তানটাকে সরে যেতে বলুন।' ফুলার কথা শুনে নগেন অবাক হয়ে বিনুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কিন্তু বিনুর মুখে সে কিছুই পড়তে পারল না। বিনু হাত দিয়ে চোখের ওপর থেকে লম্বা চুলের রাশ সরাতে সরাতে বলল, 'ঠিক আছে, আমি চলে যাচ্ছি, আপনি কথা বলুন।'

বিনু ত্রিসীমানায় নেই শুনে ফুলা দরজা খুলল। ঘরের দরজা খুলতেই নগেনের চোখ ঝলসে গেল। ঘরের সবকটা আলো জ্বল জ্বল করে জ্বলছে আর সেই উজ্জ্বল আলোর সামনে দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছে ফুলা। তার দীর্ঘ শরীর একটু কৃশ দেখালেও মুখ যেন অস্বাভাবিক

উজ্জ্বল। চুল বাঁধেনি, পিঠ বেয়ে কোমরের কাছে ঘন হয়ে পড়ে আছে। শাড়ির রঙ গাঢ় নীল, তার উপর সাদা ডুরে। ফুলাকে এমনি দেখতে সুন্দর আজ যেন আরো সুন্দর দেখাচ্ছে। নগেন ফুলার দৃষ্টিতে কোনো অস্বাভাবিকতা খুঁজে পেল না।

ফুলাই প্রথমে কথা বলল খুব স্বাভাবিক গলায়, 'আসুন, ভিতরে আসুন।' নগেন জুতোটা বাইরে খুলে আসতে চাইছিল। ফুলা বলল, 'জুতো পায়ে দিয়েই আসুন, বাইরে রাখলে চুরি হয়ে যাবে।' ফুলার এই কথায় নগেন একটু অস্বাভাবিকতা খুঁজে পেল। বাড়ির ভেতর থেকে, কিভাবে জুতো চুরি হবে নগেন ভেবে পেল না। নগেন ঢুকতেই ফুলা ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। ফুলা দরজা বন্ধ করায় নগেন একটু অস্বস্তি বোধ করল। ফুলা যদি বন্ধ ঘরে খুব অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে তা হলে নগেন কি করবে!

ঘরে ফুলা বোধহয় একটা ধুপ জ্বেলে রেখে ছিল, সুন্দর গন্ধে ভরে আছে। এক কোণে টান টান করে বিছানা পাতা, পরিষ্কার চাদর, পরিষ্কার টেবিলের ঢাকা, সমস্ত ঘর সুন্দর নিঁখুত করে সাজানো। নগেন ঘরের চেহারা দেখে খুব অবাক হল। যে এত সুন্দর করে ঘর সাজাতে পারে তাকে অস্বাভাবিক বলা যায় কেমন করে! দরজা বন্ধ করে ফুলা জানলার ধারে বসে নগেনের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। নগেনকে অবাক হতে দেখে ফুলা বলল, 'খুব অবাক হয়েছেন, তাই না?'

'তা একটু হয়েছি। আমি সকাল থেকে ভাবছি, এই আসবে, এই আসবে, অফিসে এসে বিনুর কাছে অন্য কথা শুনলুম।'

ফুলা হাসল। হাওয়ায় তার চুল উড়ছে, শাড়ির আঁচল উড়ছে। কপালের মাঝখানে সাদা টিপে মুখটা ভারি মিষ্টি দেখাচ্ছে। ফুলা বললে, 'ওই তো যাবার আয়োজন সব প্রস্তুত, আজই আপনার সঙ্গে চলে যাব।' নগেন তাকিয়ে দেখল ঘরের এক কোণে একটা হালকা সুটকেস। ফুলার যাবার কথা শুনে নগেনের সন্দেহ হল, ফুলা তাহলে প্রকৃতই মানসিক সুস্থতা হারিয়েছে। তা না হলে হঠাৎ এই ধরনের কথা বলবে কেন? ফুলা বোধহয় নগেনের মনের কথা অনুমান করতে পেরেছিল। সে হেসে

বলল, 'এ বাড়ির কারুর কথা বিশ্বাস করবেন না, এখানে গভীর চক্রান্ত চলেছে,আজ আপনার সঙ্গে এই যে বেরিয়ে যাব আর এ বাড়ির চৌকাঠ মাড়াবো না।'

নগেন ফুলার কোনো কথারই মাথামুণ্ড বুঝতে পারল না। হঠাৎ মনে হল সে যেন কোনো রহস্য নাটকের মাঝখানে রঙ্গমঞ্চে এসে প্রবেশ করেছে। সে এবার পরিষ্কারভাবেই ফুলাকে জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপারটা কি ? আমি তোমাদের কারুর কথাই বুঝতে পারছি না।'

ফুলা ধরা গলায় বলল, 'আপনার মতো জগৎছাড়া লোক জগতের নোংরামি কি করে বুঝবেন ? দিদি আপনার হাতে পড়ে বেঁচে গিয়েছিল, বেশি দিন ভোগ করতে পারল না এই যা দুঃখ।' নগেন অবাক হয়ে দেখল ফুলা কাঁদছে। বড় বড় দু'চোখ বেয়ে জলের বিন্দু নামছে। নগেন এর আগে যতবার ফুলাকে দেখেছে তার বেদনার দিকটা কখনও দেখতে পায়নি। সব সময় তাকে উচ্ছল, হাসিখুশী দেখেছে। ফুলার চোখের জল দেখে নগেন খুব অস্বস্তি বোধ করল। জীবনের এই সব মুহূর্তে মানুষের কি করা উচিত তার জানা নেই। নিজের স্ত্রী ছাড়া জীবনে কখন অন্য কোনো মহিলার সান্নিধ্যে সে আসেনি। স্ত্রী হলে কাছে টেনে নিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করা যেত। স্ত্রীর সঙ্গে এই ধরনের মুহূর্ত তার জীবনে বহুবার এসেছে। তাদের সংসারে মল্লিকাকে অনেক চোখের জল ফেলতে হয়েছে। সে আঘাত নগেনের দিক থেকে খুব কমই এসেছিল, এসেছিল নগেনের বাবার দিক থেকে। মল্লিকা চলে যাবার পর নগেনের এই একটিমাত্র সান্ত্বনা,নগেন খুব কমই তাকে আঘাত করেছে, নগেনের বিবেক নির্জন রাতে কখনই তার মুখোমুখি হয়ে বলবে না 'নগেন তুমি নিষ্ঠুর ছিলে।'

নগেন তবু উঠে দাঁড়াল। একটু ইতস্তত করে জানলার ধারে ফুলার কাছে এগিয়ে গেল, তারপর তার ডান হাতটা ফুলার মাথায় খুব আলতো করে রেখে বলল, 'তুমি কাঁদছ।' ফুলা নগেনের বুকে মাথা রেখে হু হু করে কেঁদে উঠল। ঘরে সেই সময় অন্য কোনো তৃতীয় ব্যক্তি থাকলে

নগেনের মুখের অবস্থা দেখলে করুণা বোধ করত। নগেন কিছুতেই সহজ হতে পারছে না, আড়ষ্টতা কাটাতে পারছে না। তার কেবলই মনে হচ্ছে সে হয়ত কোনো অপরাধ করে ফেলেছে।

ফুলা তখন নগেনের বুকে মুখ গুঁজে দুহাতে তাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। নগেন ফুলাকে কখনই অন্যভাবে দেখেনি। ফুলাকে সে সব সময় ছোট বোনের মতোই ভালবেসেছে অথচ এই মুহূর্তে ফুলার সমস্ত শরীরের ভার নিজের উপর নিয়ে নগেন খুবই বিব্রত বোধ করল। আস্তে আস্তে তার চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'ফুলা, শান্ত হও, আমাকে ব্যাপারটা বুঝতে দাও।' ফুলাকে সাবধানে খাটের দিকে এগিয়ে নিয়ে এল। রাস্তার ধারের খোলা জানলার সামনে এই ধরনের দৃশ্য বড় মারাত্মক। নগেন ফুলাকে খাটের একধারে বসিয়ে দিল। বহুক্ষণ ধরেই ঘরের সবকটা আলো একসঙ্গে জ্বলছিল বলে তার চোখে লাগছিল। একটা কম আলো রেখে সবকটা আলো নিভিয়ে দিল। এতক্ষণে ঘরটা বেশ স্নিগ্ধ লাগছে।

নগেন নিজের চেয়ারে বসার আগে ফুলার আঁচল দিয়ে ফুলারই চোখ মুছিয়ে দিল। 'তুমি আমাকে পরিষ্কার করে বল ব্যাপারটা কি, আমি তোমার কি করতে পারি?'

'সব পারেন, আপনি আমাকে নতুন জীবন দিতে পারেন।' ফুলার গলা তখনও কান্না-জড়ানো।

নগেন ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য বলল, 'কি ভাবে?'

'আমাকে গ্রহণ করে।' ফুলার চোখ দুটো যেন অস্বাভাবিক চকচকে। ফুলার উত্তর শুনে নগেন স্তম্ভিত হয়ে গেল, এ কি কথা? এমন কথা তাকে শুনতে হবে সে স্বপ্নেও ভাবেনি। তার নিজের বয়স চল্লিশের দিকে চলেছে। ঘাড়ের কাছে দুটো-একটা চুলে পাক ধরেছে। মাথার সামনের চুল পাতলা হয়ে এসেছে। শরীর যত না ভাঙুক, মনটা একদম ভেঙে গেছে। মনে সব সময় কে যেন বেহালার ছড় টেনে চলেছে। এই রকম একজন আধবুড়ো মৃতদার লোক কেমন করে ফুলার মন দখল

করতে পারে। ফুলা সত্যিই পাগল হয়ে গেছে। আর তা না হলে একটা প্রচণ্ড রকমের বড় আঘাতকে সামলাবার জন্যে এই ধরনের আত্মহননের পথ বেছে নিতে চলেছে। নগেন ব্যাপারটাকে আর লঘু করে নিতে পারল না। সে একটু রুষ্ট হয়েই বলল, 'তুমি কি পাগল হয়েছ ?

'হ্যাঁ, পাগল হয়েছি। আমাকে আপনার সংসারে স্থান দিতেই হবে।'

'তা কি করে সম্ভব! আমি এমন কথা কখনও চিন্তা করিনি।'

'আপনি না করলেও আমি করেছি। গত এক বছর ধরে করছি।'

'এ ছাড়া তোমার অন্য কোনো অনুরোধ থাকলে করতে পার আমি শুনব, আর তা না থাকলে আমি এখন উঠব।'

নগেন কথাটা বোধহয় একটু জোরে বলে ফেলেছিল, ফুলা পাথরের মূর্তির মতো বসে রইল। ফুলার চোখে আবার জল নেমেছে। নগেন মহা বিপদে পড়ল। এই ধরনের অদ্ভুত পরিস্থিতিতে সে কখনও পড়েনি। ফুলাকে শান্ত করার জন্যে সে যুক্তিতর্কের রাস্তায় চলে দেখতে চাইল।

'তুমি একটু বুঝে দেখ ফুলা, আমি একটা পঞ্চাশ বছরের বুড়ো, ঘাটের দিকে পা বাড়িয়ে বসে আছি। যা কিছু করবে ভেবেচিন্তে করবে। তোমার নিজের জীবনের একটা সাধ আহ্লাদ আছে তো!'

'আমার একটা সাধ, সে সাধ হল যাকে আমি শ্রদ্ধা করি তাঁর কাছেই জীবন কাটাতে চাই। অনেক হৈ হৈ করেছি। অনেক কিছু দেখেছি। দেখতে আমার বাকি নেই কিছু। এখন একটু শান্তি চাই, এখন একটু গভীরতা চাই। জীবনের গভীরতা আমি আপনার মধ্যেই দেখেছি।'

'এসবই তোমার মনের বিকার। তোমার মতো শিক্ষিত মেয়ে এত সহজে হেরে যাবে! হয়ত আঘাত পেয়েছ, তাতে কি ? ব্যর্থতার পেছনেই তো আসে সাফল্য। একটু অপেক্ষা করতে হয়, একটু ধৈর্য ধরতে হয়।'

ফুলা হঠাৎ নগেনের সামনে এসে দাঁড়াল, 'আমাকে কি আপনি ছেলেমানুষ মনে করেন ? আপনি তো সব সময় আমার বাইরেটাই দেখেছেন, আমার ভেতরটা কি দেখার চেষ্টা করেছেন কোনোদিন ?'

'তোমার ভেতরটা দেখার কোনো প্রয়োজন তো ছিল না ফুলা !'

'এখন আমার অনুরোধে তা ভাবতে হবে। আমি আগে বলিনি, এখন সুযোগ এসেছে বলে বলছি।'

'যা হবার নয় তুমি তাই ভাবতে বলছ। আমি একজনের স্মৃতি নিয়ে বাকি জীবনটা কাটাতে চাই। আমার জীবন কাটাবার নিজস্ব একটা ধরন আছে। তুমি দুঃখ পেলেও আমার কিছু করার নেই।'

'নিশ্চয়ই আছে। আমি আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করেছি, আর আমি জানি আপনি নিষ্ঠুর নন। আপনার হৃদয় আছে। একটা জীবন আপনার মধ্যে পূর্ণতা খুঁজছে, তাকে আপনি ফেরাতে পারেন না।'

নগেন বেশ বুঝল ফুলা শুধু নিজের দিকটাই দেখছে। কথা দিয়ে যুক্তি দিয়ে সে নয়কে হয় করতে চাইছে। স্ত্রীর মৃত্যুর এক বছরের মধ্যে একটা লোক আবার বিয়ে করতে পারে না, চক্ষুলজ্জা বলেও তো একটা জিনিস আছে। তাছাড়া নগেন মল্লিকার শূন্য আসনে আর কাউকে বসাতে প্রস্তুত নয়। তারপর উল্কা। উল্কাকে সে কি বোঝাবে ? না না, ফুলা সত্যিই তার স্বাভাবিকতা হারিয়েছে ! তা ছাড়া ফুলা নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত নিজে কি করে নিতে পারে ! তার মা আছে, ভায়েরা আছে। নগেন এখন পালাতে পারলে বাঁচে। ফুলাকে কোনো রকমে কাটাবার জন্য নগেন বলল, 'ঠিক আছে, আমাকে একটু ভাববার, একটু প্রস্তুত হবার সময় দাও। তুমি বললে এক বছর ধরে ভাবছ ! আমাকে অন্তত এক সপ্তাহ ভাবার সময় তো দেবে !'

'সময় ! সময় পেলেও আপনি কিছু করতে পারবেন না। আমি আপনাকে জানি। আপনি বহু ধরনের 'কিন্তু' আর 'যদি'র পাল্লায় পড়ে আছেন। আমি আজই আপনার সঙ্গে যাব। আমাকে না নিয়ে গেলে আপনার মুক্তি নেই ! আপনার উপর জোর করার অধিকার আমার আছে।'

নগেন বলল, 'আজ সকাল অবধি তোমাকে আমার বাড়িতে মাসখানেকের জন্যে পেতে আমার কোনো আপত্তিই ছিল না, কিন্তু এই

মুহূর্তে তুমি আমার বাড়িতে যেতে চাইলে আমার আপত্তি আছে। আমি জেনেশুনে কারুর জীবন নিয়ে খেলা করতে পারবো না।'

ফুলা এইবার ফুঁসে উঠল, 'আপনার জীবনে এখন স্ত্রীর প্রয়োজন আছে। আপনার সংসার ভেসে যেতে পারে না। সামনে এখনও অনেকটা পথ পড়ে আছে। সে পথে আমরা দুজনে চলতে পারি। তা ছাড়া উল্কার কথাও ভাবতে হবে। মাইনে করা লোকের কাছে কাজ পাওয়া যেতে পারে, স্নেহ ভালবাসা পাওয়া যায় না। আর স্মৃতির কথা বলছেন। স্মৃতির মতো বিশ্বাসঘাতক কিছুই নেই।'

'আমি তোমার সব কথাই স্বীকার করছি। তবে আমাকে একটু ভাববার সময় দাও। উল্কাকে হাসপাতাল থেকে ফিরতে দাও।'

'আমি তো এখনই কিছু করতে বলছি না। আমি ওখানে থাকতে থাকতে আপনি মনকে প্রস্তুত করার সময় পাবেন। অন্য কোনো ভাবে গিয়ে সংসার দখল করার আগে আমি খোলাখুলি কথা বলে নিতে চাই।'

'বেশ তো। তার আগে আমি তোমার মার সঙ্গে কথা বলে নি।'

'মা!' ফুলা যেন ঘৃণায় ফেটে পড়ল, 'সংসারের কোনো ব্যাপারে মার কিছু বলার অধিকার নেই।'

'বেশ, বিনুর সঙ্গে কথা বলি।'

'হু ইজ বিনু', ফুলা যেন আরো রেগে গেল, 'বিনু কে? এ বাড়ির ইট কাঠ পাথরের মতোই বিনু একটা নিষ্প্রাণ পদার্থ।'

নগেন মহা বিপদে পড়ল। 'কিন্তু এত রাতে যাবে কি করে?'

'রাত? এর চেয়ে অনেক রাতে আমি অনেক জায়গায় গেছি। আপনি আমার সঙ্গে যাবেন। চলুন আমি প্রস্তুত।' ফুলা সুটকেসটা হাতে তুলে নিল। নগেন ঘড়ি দেখল, রাত প্রায় সাড়ে নটা। ফুলা দরজা খুলে বেরিয়ে এল, পেছনে নগেন। 'বিনুকে বলে যাই।' ফুলা হাত নেড়ে বলল, 'কিছু প্রয়োজন নেই। কাকে বলবেন, ও তো সন্ধ্যে থেকেই ম্যানড্রেক্স খেয়ে পড়ে আছে।'

ফুলা আর নগেন রাস্তায় এসে দাঁড়াল। নগেনের কিছুই ভাল

লাগছিল না। ব্যাপারটা এতই অদ্ভুত এবং এর পরিণতি কি দাঁড়াবে বলা শক্ত। নগেনের মনটা তখন একেবারেই শূন্য হয়ে গেছে। সে আর কিছুই চিন্তা করতে পারছিল না।

প্রায় জনশূন্য রাস্তা। ফুলার মা তখনও ফেরেননি। একটা-দুটো খালি বাস দূরে মোড় ঘুরে চলে যাচ্ছে দেখল। দুজনে পাশাপাশি হেঁটে মোড়ের দিকে এগোচ্ছে। নগেন মোড়ের কাছে এসে একটা দোকানের সামনে দাঁড়াল। বাস আর আসে না। নগেন বলল, 'তুমি এখানে একটু দাঁড়াও। আমি এগিয়ে গিয়ে দেখি ট্যাক্সি পাই কি না?' নগেন দূরে পোলের দিকে এগিয়ে গেল। ফুলা পায়ের কাছে সুটকেস নামিয়ে রেখে দাঁড়িয়ে আছে। নগেন একটু এগিয়ে পোলের দিক থেকে একটা ট্যাক্সি আসতে দেখল। হাত দেখাতেই ট্যাক্সিটা থামল। নগেন উঠে বসল। নগেনকে উঠতে দেখে ফুলা পায়ের কাছ থেকে সুটকেসটা হাতে তুলে নিল। ট্যাক্সিটা ফুলার দিকে এগিয়ে আসছে। হঠাৎ গাড়িটা একটা পুরো বাঁক নিয়ে ঘুরে গেল উল্টো দিকে। ফুলা দেখল পেছনের লাল আলোটা দ্রুত পোলের মাথার উপর উঠে গড়িয়ে নীচে নেমে গেল। নগেন পেছনের সিট থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল ফুলা সুটকেস হাতে সোজা দাঁড়িয়ে আছে। দোকানের আলোয় তার দীর্ঘ চেহারা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। গাড়িটা ঢালুতে নেমে যেতে ফুলা দৃষ্টিপথ থেকে হারিয়ে গেল।

ফুলাকে এইভাবে ফাঁকি দিতে পেরে নগেনের বেশ ভাল লাগছিল। এই শেষ দেখা। আর কোনো দিন না, এমুখো সে আর কোনোদিন হবে না। গাড়িটা কিছুদূর এগোতেই ফুলার মনের শূন্যতা নগেনের মনকে ছেয়ে ফেলল। কাজটা ভাল হল না। ঝোঁকের মাথায় নগেন খুব একটা অন্যায় করে ফেলেছে। মনের মধ্যে বিষণ্ণতার গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হল। নগেন হঠাৎ ড্রাইভারকে বলল, 'গাড়ি ঘোরাও।' ড্রাইভার একটু অবাক হল, জিজ্ঞেস করল, 'কোন দিকে ঘোরাবো।'

'যে দিক থেকে এসেছেন সে দিকেই চলুন, খুব জোরে চালান,

ভীষণ একটা ভুল হয়ে গেছে।'

ড্রাইভার কি ভাবল কে জানে। গাড়িটা ঘুরে গেল। রাতের জনশূন্য রাস্তা, টপ স্পিডে গাড়ি চালাতে কোনো অসুবিধেই হল না। পোলের উপর উঠতেই নগেন সামনে ঝুঁকে দোকানটা দেখবার চেষ্টা করল।

'কোথায় যাব?'

'চলুন চলুন, সামনে এগিয়ে চলুন।'

দোকানটার সামনে গাড়িটা এসে দাঁড়ালো। দোকান বন্ধ। রাস্তা অন্ধকার। কেউ কোথাও নেই। ফুলা যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে একটা ঠোঙা পড়ে আছে। নগেন সেই অন্ধকার দোকানের সামনে স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। উল্টো দিকে একটা অন্ধকার মতো জায়গায় ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে পড়েছে। পেছনের লাল আলো রাস্তার খানিকটা অংশে একটা স্তব্ধ আশঙ্কার মতো ছড়িয়ে গেছে। অন্ধকারে বসে ড্রাইভার একটা সিগারেট ধরিয়েছে। সিগারেটের আগুনে তার কপাল নাক ঠোঁটের কিছুটা অংশ আঁকা রয়েছে।

নগেন এখন কি করবে? ফুলা কি বাড়ি ফিরে গেল? নগেন একবার ভাবল খোঁজ নিতে যাবে, তারপর ভাবল ফুলা যদি ফিরে না গিয়ে থাকে তাহলে সে কি কৈফিয়ত দেবে। দোকানটা খোলা থাকলে সে জিজ্ঞেস করতে পারত। দোকানটাও বন্ধ হয়ে গেছে। ড্রাইভার সিগারেটের শেষ অংশটা রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিল। কয়েকটা আগুনের ফুলকি উড়ল হাওয়ায়। ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল,'কি হল? যাবেন তো?'

নগেন চমকে উঠল। 'হ্যাঁ যাব।'

নগেন ধীরে ধীরে গাড়িতে এসে উঠল।

গাড়ি আবার পুরো একটা বাঁক নিয়ে পোলের উপর উঠে গেল। অনেক রাত হয়েছে। নির্জন রাস্তা দিয়ে গাড়ি ছুটছে। ভিক্টোরিয়া পেছনে চলে গেল, ময়দান পেছনে পড়ে রইল, রইল চৌরঙ্গী। নগেনের বুকটা মুচড়ে উঠল। অন্ধকার গাড়ির পিছনের সিটে বসে নগেন সেই প্রথম অনুভব করল, তার মনের আসনে মল্লিকার জায়গায় ফুলা এসে বসেছে।

আপাতত আমার কোন কাজ নেই। বেশ ধীরেসুস্থে সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটি সিগারেট বের করে ঠোঁটের ডগায় লাগালুম, হাতের তালু দিয়ে আড়াল করে একটিমাত্র কাঠি খরচ করে তাতে অগ্নি-সংযোগ। মাথার উপর সজোরে পাখা ঘুরছে। এ কায়দাটা অনেকদিনের শেখা। বেশ লম্বা একটা টান দিয়ে একরাশ গোলাপী ধোঁয়া সিলিংয়ের দিকে ছুঁড়ে দিলুম। মনে হল ঐ ধোঁয়ার সঙ্গে আমার সমস্ত চিন্তা আর পরিবেশকে উড়িয়ে দিতে চাইছি। না, আমি এখন সেই কুড়ি বাই কুড়ি ফিগারড গ্লাস মোড়া, সুশীতল একজিকিউটিভ ঘরে বসে নেই। আমি বসে আছি ভিজিটারস রুমে। সামনে সেণ্টার-টেবলে ইলাসট্রেটেড উইকলীর পাতা হাওয়ায় উড়ছে। একটা মেয়ে তার শরীরের প্রায় অধিকাংশ অংশ অনাবৃত করে একটি বিশেষ ধরনের শাড়ি পরার কথা ঘোষণা করছে। আমি জানি এই মুহূর্তে মিস্ শীলা বিশ্বাস আমার এন্টি চেম্বারে বসে সরু সরু আঙুলে সেই সার্টিফিকেটটি প্রায় টাইপ করে ফেলেছেন। এরপর ঐ সুন্দর চৌকো কাগজটি চলে যাবে মিঃ ব্রাউনের ঘরে। কালো কালিতে মোটা সই। বক্তব্য—পার্থ ওয়াজ এ ব্রিলিয়াণ্ট একজিকিউটিভ, হি উইল বি এন অ্যাসেট টু এনি কোম্পানী। হিজ সেলসম্যানশিপ হ্যাভ নো কমপেরিজন। তবুও মিঃ ব্রাউন খুব দুঃখের সঙ্গেই আজ থেকে আমাকে ছাঁটাই করলেন। কারণ বিজনেস ডাল। হাই পেড একজিকিউটিভদের সরাতে হচ্ছে। কাণ্ট হেল্প। কোম্পানী শিগ্‌গির পাত্তাড়ি গোটাবে। ল অ্যাণ্ড অর্ডার সিচ্যুয়েশন অফুল, গভর্নমেণ্ট পলিসি নট এনকারেজিং। সো পার্থ ইউ গো। তুমি বিদেয়

হও। তুমি সাত বছর ধরে বহুত সার্ভিস দিয়েছ। আমরা ভুলব না।

মিঃ ব্রাউন একটা সার্টিফিকেট না দিয়ে ছাড়বেন না। অন্য কোথাও চাকরি করতে গেলে প্রয়োজন হবে। এই মুহূর্তে আমার কোন কাজ নেই। আমি অবশ্য এখনও কোম্পানির অ্যাকাউণ্টে একটা কোল্ড ড্রিঙ্কসখেতে পারি। আজকের মতো সেই চকোলেট রঙের অ্যামবাসাডার আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে পারে। অবশ্য আমি এর কোনোটাই চাইব না। পার্থ এখন নতুন মানুষ। আজ দেড়টায় সে কোনো হোটেলে লাঞ্চ খাবে না। এক লক্ষ টাকার পেণ্ডিং অর্ডার তুলে দেবার জন্যে তাকে মাথা ঘামাতে হবে না। সে একটু পরেই পরম নিশ্চিন্তে ব্র্যাবোর্ণ রোড ধরে সোজা ধর্মতলার দিকে হাঁটা দেবে, বুক টান টান করে।

যদিও মুখে একটা হাসি হাসি বেপরোয়া ভাব নিয়ে বসে আছি, খুব একটা আলগোছা ভাব। তাল তাল ধোঁয়া ঠোঁটটাকে সরু করে হাওয়ায় ভাসিয়ে দিচ্ছি ; কিন্তু মনের মধ্যে একটা ফাঁকা আকাশ মাঝে মাঝে উঁকি দিচ্ছে, মনে হচ্ছে একটা সীমাহীন রাস্তার এক মাথায় একটা নিঃসঙ্গ মানুষের মতো দাঁড়িয়ে আছি। সামনে যেন একটা অতল খাদ একটি ধাক্কার অপেক্ষা, তারপর সেই নিরালম্ব পতন····

মিস্ শেলী বিশ্বাস কি অনন্তকাল ধরে একটা ছোট্ট সার্টিফিকেট টাইপ করবে ! একটা টেলিফোন কি থেমে থেমে সৃষ্টির শেষ দিন পর্যন্ত বেজে চলবে ! ঐ কোণ থেকে পুলকেশ কি আমার দিকে আমৃত্যু তাকিয়ে থাকবে ! সকাল এগারটা থেকে বারটা অবধি নাটকের গতি ছিল অতি দ্রুত কিন্তু তারপর থেকে যেন অতি মন্থর। দশটা তিরিশ, পার্থ সেন চকচকে অ্যামবাসাডার থেকে টুক্ করে নামলো। টক্ টক্ করে সিঁড়ি ভেঙে লিফট, লিফট থেকে নেমেই এয়ার-কণ্ডিশানড চেম্বার। ব্রিফকেস রাখল কোণে চকচকে ফর্মাইকা লাগানো বুককেসের উপর। টাইয়ের ফাঁস আলগা করে ঘূর্ণায়মান চেয়ারে বসল। একটা ফোন। বিটার অ্যাণ্ড বোর্নের ডিরেকটার ও-প্রান্তে। অ্যামেরিকান অ্যাকসেণ্ট-

ইয়েপ, ইয়া। গত সন্ধ্যের আপ্যায়ন ব্যর্থ হয়নি। টোপ গিলেছে। এক লাখ টাকার অর্ডার, একটা বিরাট মাছের মতো জলে চকচক করছে। খরচ হয়েছে সর্বসাকুল্যে হাজার দু-এক। গ্র্যাণ্ডে দুটো সিট বুক করতে হয়েছে। ছটা থেকে নটা, তরল পদার্থের স্রোতধারা। তারপর কোলকাতার 'পশ' এলাকায় একটা ঘর বুক। সেখানে এনাক্ষী না মীনাক্ষী। ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস ৩৬-২৭-৩৬। সুপার্ব। পার্থ ইউ আর এ জিনিয়াস। কোথা থেকে যে তুমি পাও? রিয়েলি আই হ্যাড এ চার্মিং ইভনিং। ইয়েস ওয়ান ল্যাখ। কিন্তু আমি তো অত অল্পে সন্তুষ্ট হই না। দ্যাটস রাইট। বিগিন উইথ ওয়ান অ্যাণ্ড....সাহেব কোটির কমে আমি ছাড়ব না'। কটা এনাক্ষী চাই তোমার। ইণ্টারকম গোঁ গোঁ করে উঠল। বিটার অ্যাণ্ড 'বোর্ণকে ছেড়ে রিসিভার তুললাম। ইয়েস মর্নিং মিঃ ব্রাউন। কি ব্যাপার সাত সকালে! ভেরি আর্জেণ্ট। লিফটে ফিফথ ফ্লোর। মিঃ ব্রাউনের চেম্বার। এগারটা বেজে পাঁচ, হ্যাভ এ কাপ অফ কফি। সো আর্লি। এভরি টাইম ইজ কফি টাইম। কফিতে চুমুক। আলোচনা—লঅ্যাণ্ড অর্ডার। 'জাল বিজনেস', ইত্যাদি ইত্যাদি। এগারটা তিরিশ, রিয়েলি আই অ্যাম সরি। কিন্তু আন অ্যাভয়ডেবল। পার্থ, তিন মাসের মাইনে অর্থাৎ হাজার কয়েক টাকা, কিছু প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ইত্যাদি নিয়ে পার্থ তুমি সরে পড়। ব্রাউন ব্রাদার্স তোমার মতো একটি শ্বেত হস্তিকে পুষতে পারছে না। ইণ্ডিয়ান এস্টাবলিশমেণ্ট থাকবে কি না জানি না। ইণ্ডিয়ান ডিরেকটার্সদের 'হেড-এক'। পার্থ সেন চোখ তুলেছিল। ব্রাউনের মাথার উপর পিছনের প্যানেলে যে সমস্ত চার্ট ঝুলছে তাতে সেল কার্ভ কিন্তু ক্রমশই উর্ধ্বমুখী। সেই উর্ধ্বমুখী গতি কি পার্থ সেনের জন্যে না পুলকেশ বিশ্বাসের জন্যে না সেই সব মহিলাদের জন্যে এনাক্ষী, মীনাক্ষী, ভাইট্যাল স্ট্যাটিসটিকস ৩৬-২৭-৩৬ সুপার্ব। পার্থ, তুমি রিয়েলি একটা জিনিয়স।

কফির শেষ চুমুক একটু বিস্বাদ, তেতো, যেন কি রকম একটা। ব্রাউনকে বলা যেত দেশের 'লেবার ল' আজকাল যথেষ্ট কড়া। সহজে

কাউকে 'স্যাক' করা যায় না। কিন্তু না পার্থ' তুমি তো লেবারার নও। তুমি একজন একসিকিউটিভ। স্যোসালিসটিক স্টেটে তোমার কোনো প্রোটেকসান নেই। ব্রাউন, অথবা ডালমিয়া কিংবা পারেখ কিংবা চৌধুরীদের কৃপায় তোমাকে বাঁচতে হবে। কিন্তু প্রকৃত কারণটা কি। কাল সন্ধ্যেবেলায় যে পার্থ সেন গ্র্যাণ্ডে বসে বেলী ড্যান্স দেখেছে, মাঝে মাঝে কাটগ্লাসের গেলাসে চুমুক দিয়েছে, দাঁত দিয়ে পাইপ চিবিয়েছে, যে পার্থ সেন আজ কিছুক্ষণ আগেও একটা চকচকে গাড়িতে হুস করে অফিসে এসেছে, ঠাণ্ডা ঘরে ঢুকেই পাশ থেকে শেলী বিশ্বাসের বুকের প্রোজেকসান দেখেছে, হঠাৎ তার পায়ের তলা থেকে পাটাতন সরিয়ে নেবার মানেটা কি!

বারোটার সময় চোপসানো বেলুনের মতো সেন সাহেব নিজের ঘরে ফিরে এসেছে। চোখে জল, মুখে হাসি। বোঝবার উপায় নেই মানুষটার মনের খবর। অবশ্য ঠিক সেই মুহূর্তে শেলী বিশ্বাসকে আর ভালো লাগছিল না। অন্যদিন চেয়ারের পাশে কিছু একটা সই করাতে এসে নিতম্বটা সামান্য ঘুরিয়ে যখন হাত অথবা কাঁধ স্পর্শ করতো একটা আলাদা অনুভূতি হত। গায়ের গন্ধের সঙ্গে দামী ফরেন সেন্টের গন্ধের মিলনে একটা সেক্স সেক্স ভাব আসত। সিল্কের শাড়ি মাঝে মাঝে খুলে টেবিলের কোণায় লুটোতে চাইত। পুরো ব্যাপারটাই বেশ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। পার্থ সেনকে একটু এক্সট্রা প্লিজ করার চেষ্টা। আজ কিন্তু শেলী বিশ্বাস কেন, বিশ্বসুন্দরী এসেও যদি প্রেম নিবেদন করে পার্থ সেন প্রত্যাখ্যান করবে। কারণ সে শকড্। আপাতত বেঁচে থেকেও মৃত। কারণ সে কর্মচ্যুত। মাসিক দেড় হাজার টাকার একটা শক্ত প্রতিশ্রুতি, একটা সুন্দর নরম উষ্ণ কোলের মতো নির্ভরযোগ্য উপার্জনের আশ্রয় থেকে আজ সে বঞ্চিত। ভিজিটার্স রুমের একটা কৃত্রিম পরিবেশে আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতো বসে থাকা। যেন চাকরির উমেদার। শ্রীপার্থ সেন—উর্দী পরা বেয়ারা হেঁকে যাবে। ব্রীফকেস হাতে উঠে দাঁড়িয়ে ফিগার্ড গ্লাসের সুইং ডোর খুলে, বোর্ড অফ ডিরেকটার্সদের

ঘরে ঢুকতে হবে। হয়ত ইন্‌টারভিউ বোর্ডের সবাই বাঙালী; কিন্তু কথা চলবে ইংরেজীতে। মে আই কাম ইন। গুড মর্ণিং। আর য়ু পার্থ সেন। আচ্ছা আপনি তো ইঞ্জিনিয়ার। বলতে পারেন স্যুয়েজ খালের উপর একটা ব্রিজ বানাতে ক টন লোহা লাগবে। আর একজন প্রশ্ন করবেন সঙ্গে সঙ্গে, ইঞ্জিনিয়ারিং সেলসের কৌশলটা কি। বিদেশে রপ্তানী বাড়াতে হলে কি করা উচিত। আর একজন—ক্যান ইউ সেল এন এসকিমো ইন দি অ্যান্‌টারটিক। পার্থ সেনকে নিয়ে পাঁচটা বেড়াল থাবা দিয়ে উল্টে পাল্টে খেলবে। মাঝে মাঝে চিৎ করে দেবে। তারপর এক সময় খেলা শেষে জনৈক সভ্য প্রশ্ন করবেন, এনি মোর কোশ্চেনস? অন্যেরা বলবেন নো, দ্যাটস অল। ঘর্মাক্ত পার্থ সেন মুক্তি পাবে।

পার্থ সেন একটু নড়ে চড়ে বসল। কি হচ্ছে কি? একটা ছোট্ট সার্টিফিকেট টাইপ করতে ক' বছর লাগে। শেলী বিশ্বাস, ইয়্যু আর রিয়েলি স্লো। এখন আর আমি তোমার 'বশ' নই, তা না হলে তোমাকে বরখাস্ত করে দিতুম। অবশ্য তারপর কি হত বলা শক্ত। কারণ তোমাদের তূণে অনেক লক্ষ্যভেদী বাণ আছে। তার একটিতেই হয়ত তুমি আমাকে বধ করে দিতে পার। তোমার চাকরি পাবার কথা এখনও আমি ভুলিনি।

আমার স্কুটার অ্যাকসিডেণ্ট আর তোমার চাকরি যেন এক সুতোয় বাঁধা। সেদিন কি বার ছিল—রবিবার। সময়—সকাল নটা। স্থান চৌরঙ্গী। পার্থ সেন, আমি পার্থ সেন, হলিডে মুডে চলেছি ঢিলে পাজামা আর পাঞ্জাবী পরে, স্কুটারে। একটু অন্যমনস্ক ছিলুম, অথবা গ্রহ। একটা ডবল ডেকারকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে এক সর্দারের ট্যাক্সির সঙ্গে পাশাপাশি একটু ঘনিষ্ঠতা। তারপর নার্সিং হোম। কিছুদিন শুয়ে থাকা। কিছুদিন বিশ্রাম।

এমনি সেই একঘেয়ে কর্মহীন দিনগুলোয় একটা কিছু আকর্ষণ খুঁজে নিতে হয়েছিল। কি নাম ছিল সেই মেয়েটির—বেলা বিশ্বাস। সুশ্রী, হ্যাঁ বেশ ভালই দেখতে, চটপটে। সাধারণ হাসপাতালের নার্সদের মতো

সারা মুখে একটা উদাসীন ভাব মেখে সে ঘুরে বেড়াত না। এ নার্সিং-হোমে যাঁরা আসেন, তাঁরা যাবার সময় বেশ মোটা অঙ্কের ফি কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিয়ে যান। সুতরাং সার্ভিস সম্পর্কে সকলেই সচেতন। এ ছাড়াও বেলা বিশ্বাস বোধহয় তার জীবিকাকে ভালবেসে ফেলেছিল! পৃথিবীতে কিছু মেয়ে আছে যাদের দেখলেই ভাল লাগে। কেমন যেন একটা নির্ভরতার ভাব আসে। মনে হয় বিনা চেষ্টাতেই তাদের মনের কাছাকাছি পাশাপাশি আসা যায়। মনে হয় একটু প্রশ্রয় দিচ্ছে কিন্তু বিশেষ একটা জায়গায় ভদ্রতার এমন একটা সূক্ষ্ম পর্দা ঝোলে যেটাকে তুলে ঠিক ব্যভিচারী হওয়া যায় না। খুব অপরিচিত অথচ যেন খুব পরিচিতর চেয়েও পরিচিত। নার্সিংহোমের সেই দিনগুলোর কথা ভাবতে গেলেই বেলা বিশ্বাসের আঁটোসাঁটো বর্ষার ঢলঢলে আকাশের মতো স্নিগ্ধ স্মৃতি মনে ভাসে।

শেলী বিশ্বাস, তোমাকে তোমার দিদির মতো দেখতে হলেও মনের দিক থেকে তুমি পুরো ব্যবসাদার। তোমার দিদির মুখে তোমাদের সব পুরনো একঘেয়ে কাহিনী অনেক শুনেছি। সেই দেশ বিভাগ। সেই শরণার্থী শিবির। সেই ভাইটার বিগড়ে যাবার কাহিনী। সেই আত্মীয়দের ব্যভিচারের ইতিহাস। মামা কিংবা কোন জামাইবাবু, অথবা কোন দূর সম্পর্কের দাদা। তোমাদের বাড়িতে উপকারীর মুখোস পরে আসা যাওয়া। আসলে তারা সেই শেলী অথবা বেলা কিংবা অপর্ণা এই রকম কোন চরিত্রের বিশেষ কোন উপকারেই ব্যস্ত থাকত। এঁদের বদান্যতার কিছু উদ্বৃত্ত ছিঁটেফোঁটা পরিবারের অন্যান্য সভ্যরা হয়ত পেতেন। সকলেই ব্যাপারটা বুঝতেন এবং যেহেতু এই সমস্ত যৌবনবতী মেয়েদের কল্যাণে দিনগুলো মোটামুটি অক্লেশে কেটে যেত সেই হেতু তাঁরা, মানে অভিভাবকরা অর্থাৎ সেই সব অসহায় মানুষেরা অনেক কিছু জেনেও জানতেন না, বুঝেও বুঝতেন না।

শেলী, তোমাদের সেই উপকারী মামাকে না দেখলেও বেলার মুখে তাঁর কাহিনী এতবার শুনেছি যে আমি এখন কাগজে তাঁর একটা

পোর্ট্রেট এঁকে ফেলতে পারি। তোমরা সেই বেলঘর না নিমতা কোনো একটা জায়গায় থাকতে। তোমাদের মামার হৃদয়, তোমাদের ব্যথায় বর্ষার আকাশের মতো ভারাক্রান্ত থাকত। অবশ্য তাঁরও একটা সংসার ছিল, ছেলে মেয়ে স্ত্রী আত্মীয়পরিজনে ভরা। তাদের দুঃখ তাঁর মনকে তেমন নাড়া দিত না কারণ সে দুঃখগুলো ছিল খুবই পুরনো, বাসি ফুলের মতো মোটেই আকর্ষণীয় নয়। কিন্তু তোমাদের টাটকা দুঃখ ভোরের ভিজে ভিজে শেফালীর মতো তাঁর মনের জানলায় সব সময় দুলতো।

তোমার দিদি বেলা কেন আমাকে এত কথা বলেছিল আমি জানি না। চাকরী না ইণ্টারভিউ অথবা কলকাতা দর্শন কিসের একটা নাম করে তোমার মামা একদিন বেলাকে নিয়ে তুলেছিল রিপন স্ট্রীটের একটা সাজানো ঘরে। একটি রাত। তোমার দিদি কলকাতা চিনত না। তোমার মামার গায়ে শক্তি ছিল। তোমার দিদির যৌবন ছিল। একফালি পরিচিত আকাশ রিপন স্ট্রীটের সেই ঘরে একটি চাঁদের খণ্ডাংশকে নিয়ে উঁকি দিচ্ছিল, সেইটুকু দৃশ্যই ছিল পরিচিত, বাকি অংশ অর্থাৎ সেই ঘর, বিছানা, পর্দা, এমন কি এতদিনের মামা সবই ছিল অপরিচিত। সেই ঘরে সেই রাতে তোমাদের মামা তোমার দিদিকে পৃথিবীর বাস্তব নগ্ন রূপ দেখিয়েছিল।

এই দীক্ষার ফলেই নার্সিংহোমে তোমার দিদিকে আমি এত হাল্কা, অনায়াস ছন্দে ঘুরে বেড়াতে দেখেছিলাম। কোনো দ্বিধা নেই, কোনো সঙ্কোচ নেই। পৃথিবীতে পুরুষের সঙ্গে নারীর একটিই সম্পর্ক এ কথা এ সত্য বেলা যেন জীবন দিয়েই বুঝেছে। বাকিটা যা সবই ফাঁকি, একটা নিছক আবরণ, একটা সুগার কোটিং, বেলা তা জানত। তার চোখের দিকে তাকালেই মনে হত সে যেন বলতে চাইছে,যে যাই বল আমি সবই বুঝেছি। ব্যাপারটা সেই 'গিভ অ্যাণ্ড টেক্'। তুমি কিছু দাও আমিও বিনিময়ে কিছু দি। ভবের হাটে জীবনের বেসাতি। কেনা বেচা কর। কড়ায় গণ্ডায় পাওনা বুঝে নিয়ে সরে পড়। তোমার চাকরীর কথা সে

আমাকে বলেছিল রাত নটার সময়। মাথার তলার বালিশ ঠিক করতে করতে সে একটু ঝুঁকে পড়েছিল। তার একটু বেশী ব্যবহৃত বুক আমার দৃষ্টির সামনে কিছু নিমন্ত্রণ জানাচ্ছিল। একটু যেন বেশী ঘনিষ্ঠ হবার ভঙ্গিতেই সে বলেছিল আমার বোনটার একটা চাকরী করে দেবেন? তার মামা, তার কাছ থেকে যে জিনিষ জোর করে, গুণ্ডামী করে নিয়েছিল, সেই তুরুপের তাসটি সহজে ছুঁড়ে দিয়ে সে তার বোনের চাকরীর কিস্তি মাত করতে চেয়েছিল।

নার্সিংহোমের নীল পর্দা-ঘেরা ঘরে মাসিক দেড় হাজার টাকা দামের পার্থ সেন কিছু দেবতা ছিল না। বেলা বিশ্বাসের নিবেদন সে বুঝেছিল। হাত বাড়ালে ঘণ্টাখানেক হয়ত তার ভালই কাটত। কিন্তু পার্থ সেন ছিল ভীতু। বলা যায় না পরে যদি কেউ ব্ল্যাকমেল করে। শুধু তাই নয়, বেলা বিশ্বাসের মামার সঙ্গে সে এক সারিতে আসতে চায় না। অহমিকা, প্রচণ্ড একটা আত্মমর্যাদা সে রাতে তাকে কোনো সহজ মহিলার শিকার হবার হাত থেকে রক্ষা করেছিল। শেলী বিশ্বাসের চাকরী সে রাতেই হয়েছিল। কার্যত অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার হয়ত তার তিন মাস পরে ছাড়া হয়েছিল।

মনে পড়ে সেই অ্যাপয়েণ্টমেণ্টের কথা। পার্থ তখন সবে জয়েন করেছে অফিসে। দীর্ঘ বিশ্রামের পর শরীরটা তখনও একটু ভারী ভারী। টেলিফোন বেজে উঠল। মিস্ বেলা বিশ্বাস। যার আন্তরিক পরিচর্যায় পার্থ সেন আজ সুস্থ। কি বক্তব্য ছিল সেদিন। শুধুই কি কুশল আদান-প্রদান। কেমন আছে পার্থ। কত রোগীই তো আসে। সেই মুহূর্তে পার্থর ছেড়ে যাওয়া কেবিনে কোনো জয়ন্ত কিংবা কোনো অনুপম বেলার তত্ত্বাবধানে আরোগ্যের দিকে চলেছে। যারা আসছে যারা যাচ্ছে সকলেই কি বেলার হৃদয়বেলায় একটি করে চিরস্থায়ী স্মৃতি রেখে যাচ্ছে। সকলকেই কি সে পরে টেলিফোনে দীর্ঘদিন ধরে জিজ্ঞেস করে—কেমন আছেন। না এক্ষেত্রে সেই একটি স্বার্থঘটিত ব্যাপার আছে—শেলী বিশ্বাসের চাকরী।

সেদিন সন্ধ্যায় মেট্রোর তলায় তিনজনে দেখা হল। বেলা, শেলী আর পার্থ। পার্থ যেন একটু কৃতজ্ঞ কৃতজ্ঞ, কৃতজ্ঞ ভাব দেখাতে চাইল। যেন বেলা তাকে পুনর্জন্ম দিয়েছে। ব্যবহারিক জগতে কৃতজ্ঞতা শুধু মুখে জানালেই হয় না। তা ছাড়া পার্থর একটা স্ট্যাটাস আছে। সুতরাং সেই আলোকশোভিত পার্কস্ট্রীট। কোথায় বসা যায় কিছুক্ষণ, একটু নির্জনে। পার্থ যে এখন 'সেভিয়ার'। সে তখন এক হৃদয়বান সংযমী পরোপকারী যুবকের ভূমিকায় অভিনয় করতে বাধ্য হচ্ছে। শেলীর চাকরী। একটি পরিবারকে আর্থিক সচ্ছলতার দিকে এগিয়ে দিতে হবে। তারা তিনজনে মুখোমুখি বসল ওয়াসডর্ফে। বেলা একটু সেজেছিল সেদিন। শেলীও নিজেকে যতটা সম্ভব আধুনিক করে তুলেছিল। বেলাকে যদিও প্রচ্ছন্ন ব্যবসায়ী মনে হচ্ছিল। শেলীকে কিন্তু পুরোপুরিই ব্যবসাদার মনে করতে অসুবিধা হল না। তার চাওয়া, চলা, কথা বলা থেকে নিজের সেক্সকে কৌশলে ছড়িয়ে দেবার কায়দা দেখে মনে হচ্ছিল—সে পুরোপুরি এই দশকেরই সন্তান। যে দশকে মানুষের হৃদয় একটি পাললিক শিলাখণ্ডে পরিণত হয়েছে। মন যেখানে শেওলাধরা মেঝের উপর কেবলই পিছলে যাচ্ছে। ঘুণধরা বাঁশের মতো মানুষের নীতিবোধ গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ঝরে যাচ্ছে। মানুষের দাবীগুলো মজা নদীর বুকে বড় বড় পাথরের চাঙড়ার মতো দৃষ্টিকটু ভাবে ফুটে উঠছে।

এর জন্যে শেলীকে পুরোপুরি দায়ী করা চলে না। দায়ী তার পরিবেশ, দায়ী সমাজ, যে সমাজে মানুষের মেলামেশা নিতান্তই স্বার্থের ঠোকাঠুকিতে পরিণত হয়েছে। বেলার সেদিন নাইট ডিউটি ছিল। তাকে ট্যাক্সি করে নার্সিংহোমে পৌঁছে দেবার পর শেলী আর পার্থ একেবারে মুখোমুখি হবার সুযোগ পেল। কলকাতার রাজপথে ট্যাক্সির পিছনের সিটে পাশাপাশি কাছাকাছি। শেলীর মনের অবচেতনায় রয়েছে আজ রাতে পাশে বসে থাকা এই মানুষটিকে সন্তুষ্ট করার উপর নির্ভর করছে তার চাকরী—তার জীবনের ভবিষ্যৎ। সমাজের সে স্তর থেকে

সে এসেছে, সেখানে পুরুষকে খুশী করার জন্যে একটি অস্ত্রের ব্যবহারই প্রচলিত তা হল যৌনতা। হয়ত বেলাও তাকে সেই রকম কোন নির্দেশ দিয়েছিল। ফলে পার্থর চেয়ে শেলীকেই সে রাতে বেশী 'অ্যাগ্রেসিভ' মনে হয়েছে। পার্থ সংযত সচেতন। বরং সময় সময় তার বেশ খারাপই লাগছিল। মনে হচ্ছিল—এই ধরনের একটা পরিস্থিতির মধ্যে না জড়ালেই হত। কেমন যেন বোরিং। মেয়েদের শরীর সে অনেক দেখেছে। কিন্তু তা বলে সে 'নিম্ফোম্যানিয়া'য় ভুগতে প্রস্তুত নয়। যৌনতার পায়ের তলায় সে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে লুটিয়ে দিতে পারবে না। অথচ শেলী তার বাইশ বছরের শরীরের সুঘ্রাণ ছড়িয়ে দিতে চাইছে নানা ভাবে। নানাভাবে জাগাতে চাইছে পার্থর 'অ্যাপেটাইট'। অনেকটা রাস্তা এই রকম একটা জ্বলন্ত অঙ্গারকে 'এসকর্ট' করে নিয়ে যেতে হবে সেই বেলঘর অবধি। নিছক ভদ্রতার খাতিরে। মাঝে মাঝে একটা আদিম পার্থ মাথা চাড়া দিতে চাইছিল। বলছিল কানে কানে—ইডিয়েট, সুযোগ ছাড়ছো কেন এ তো তোমার ন্যায্য পাওনা। যৌবন হল ফুল। ফুটেছে, গন্ধ ছড়াচ্ছে তুমি এখন তার ঘ্রাণ নাও। তুমি না নিলে অন্য কেউ নেবে। বোকা হচ্ছ কেন। এই যে ওয়ালর্ডফে পঞ্চান্ন টাকার বিল দিলে, এই যে ট্যাক্সির মিটারে ইতিমধ্যেই দশ টাকা কয়েক পয়সা উঠেছে, এ সবই কি পরোপকারের খেসারত। একটু কাছে টেনে নাও। একটু আদর কর, ভাল লাগবে। দেখবে সন্ধ্যেটা মধুর লাগবে। তোমার বাঁচতে ইচ্ছে করবে। কাজে উৎসাহ আসবে।

শেলী বিশ্বাস, চাকরীটা তুমি পেয়েছিলে অনেক কম মূল্য দিয়ে। এই বাজারে একটা চাকরী। চারশো টাকা মাইনের একটা চাকরী খারাপ কি। কিন্তু পার্থ সেন তোমার কাছে একটু কৃতজ্ঞতা চেয়েছিল। তুমি যে সার্টিফিকেটটা টাইপ করছ সেটা হয়ত টাইপ করার দরকার হত না। কিন্তু শেলী তুমি যতই প্রচ্ছন্ন থাকার চেষ্টা কর, পার্থ জানে ষড়যন্ত্রের ইতিহাসের শুরু কোথায় আর কারা আছে সেই ষড়যন্ত্রীদের দলে।

কি হল। এত দেরী কিসের। একটা ছোট্ট সার্টিফিকেট। তবে কি ব্রাউন আবার পুরো ব্যাপারটাই তলিয়ে দেখছে! পরিস্থিতিটা পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত, কিছুক্ষণ আগের সিদ্ধান্তকে বাতিল করে দিতে চাইছে। মনে হচ্ছে পার্থ সেনের সাত বছরের অভিজ্ঞতা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে নিতান্তই অপরিহার্য কিন্তু পুলকেশ কি ভাবছে। আমার দিকে যেন বেশ কৌতূহল নিয়েই তাকিয়ে আছে। সব কাজ ভুলে। পুলকেশ তুমি হয়ত সাময়িকভাবে জিতলে। তুমি কিছুদিন ব্রাউন ব্রাদার্সের খাতায় থাকবে। মাসের শেষে এখনও কিছুদিন চার অঙ্কের একটা চেক পাবে। তারপর তোমার সেই সমস্ত বদভ্যাসের পিছনে মাসের মাঝামাঝি সব উড়িয়ে দিয়ে বাকি মাসটা চালাবার জন্যে সেই সব অন্ধকার রাস্তায় পা বাড়াবে, যে রাস্তায় টাকা হয়ত আছে কিন্তু শান্তি নেই।

পুলকেশ তোমার একটা সুন্দর বাগান-ঘেরা বাড়ি আছে। তোমার একটা ছোট্ট নীল রঙের গাড়ি আছে। তোমার একটি রূপসী স্ত্রী আছে। আর তোমার আছে একটা সরীসৃপ স্বভাব। তোমার ঐ এঁকেবেঁকে চলা। ভোগের উপাদানের কাছে নিজেকে ক্রীতদাস করে রাখা, তুমি কি সুখী? না ঢালু রাস্তায় একবার যখন গড়িয়েছ তখন গড়িয়েই চলবে, সেই অন্ধকার খাদের দিকে। তুমি বেশ ভালোই জানো তোমার পথে আগে যারা হেঁটেছে তারা আজ কোথায়।

মনে পড়ে পুলকেশ, দীঘার সমুদ্রসৈকতে সেই 'মুনলাইট পার্টির কথা'। তোমরা সকলেই সস্ত্রীক গিয়েছিলে। বড় বড় কোম্পানীর একজিকিউটিভদের উন্নাসিক অসুস্থ কলরবে সে রাতে, সেই চন্দ্রালোকিত রাতে, সমুদ্র-সৈকত কলঙ্কিত হয়েছিল। অবশ্য তারপর অনেক ঢেউ, ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে তোমাদের ফেলে আসা পাপ ধুয়ে দিয়েছে। আমি একলাই গিয়েছিলাম পুলকেশ। আমার স্ত্রী অপর্ণা যেতে চায়নি আর সে না যাওয়ায় আমি খুশীই হয়েছিলাম। তুমি হয়ত বলবে আমি একটা অনগ্রসর গেঁয়ো মানুষ, তোমাদের মর্ডান সোসাইটিতে অচল।

পুলকেশ তাতে কিছু এসে যায় না কারণ আমি জীবনে গভীরতাকেই খুঁজেছি। খুঁজেছি শান্তি। যাক সে সব কথা। জীবনকে আমি স্বাধীন ভাবে খরচ করতে চেয়েছি বলেই, আমি অবাক হয়ে দেখেছি স্বাধীনতা, পুরোপুরি স্বাধীনতা বোধ হয় রূপকথার জিনিস। সমাজে, সংস্কারে, জীবিকায়, জীবনে মানুষ এমন ভাবে বাঁধা পড়েছে যে এ সংসারকে, শুনতে হয়ত খারাপ লাগবে, আমি বলব ক্রীতদাসের সংসার।

পুলকেশ তোমার বাবা এই কোম্পানীর একজন ডিরেক্টার। তুমি তাঁর একমাত্র সন্তান। আমরা সকলেই কারুর না কারুর সন্তান আর সেইখানেই সেই ক্রীতদাস প্রথার শুরু। অন্তত আমার তাই মনে হয়েছে। তোমার বাবা যেভাবে জীবন কাটিয়েছেন তুমিও ঠিক সেই রাস্তায় চলতে গিয়ে হোঁচট খাচ্ছ। একটা 'স্ট্যাটাসে'র পিছনে রেসের ঘোড়ার মতো দৌড়াচ্ছো। তোমার পার্টি, তোমার গাড়ি, তোমার ফ্রিজ, তোমার রুম কুলার, তোমার বিদেশী মদ তোমাকে কিনে ফেলেছে। এর যে কোনো একটা না থাকলে তোমার লজ্জায় মাথা কাটা যাবে। তুমি যে সমাজে বিচরণ কর সেখানে মানুষের বিচার হয় তার বহিরঙ্গ দিয়ে। সুতরাং তুমি জন্মসূত্রেই ক্রীতদাসের তকমা পরে জন্মেছ।

কিন্তু আমি পার্থ সেন। আমি একটু পরেই বুক টান করে ব্র্যাবোর্ণ রোড ধরে হাঁটব। একটা ভীড় বাসে শরীর গলিয়ে দিয়ে অক্লেশে ফিরে যাব আমার ফ্ল্যাটে। কেউ যদি প্রশ্ন করে গাড়ি কি হল। বলব চাকরি গেছে। জীবনকে জীবিকার যে খাঁজে ঝুলিয়েছিলাম সে খাঁজ থেকে হড়কে সরে গেছে। তোমরা পায়রা দেখেছ, নীল আকাশে পাখা মেলে উড়তে, হঠাৎ কোনো এক খোপে এসে আশ্রয় নেয়। আপাতত আমিও উড়ছি, দেখি কখন আবার কোথায় বসে একটু জিরোবার অবকাশ ঘটে।

পুলকেশ, একটা হাইড্রলিক জ্যাক দিয়ে একটা বিকল গাড়ির মতো আমাদের উপরে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেই উঁচু প্লাটফর্মে তুমি, আমি, অরুণাংশু, ব্রাউন, সিংহ, সবাই একটা জগৎ তৈরি করে বেঁচে থাকার

চেষ্টা করছি। আসল জগৎ পড়ে রয়েছে তলায়, লক্ষ লক্ষ মানুষের দুঃখ-সুখের স্পন্দন নিয়ে। তোমরা আজ আমাকে মুক্তি দিয়েছ। আমি নেমে এসেছি পৃথিবীর নোনা মাটিতে।

আমি এই মুহূর্তে ব্রাউন ব্রাদার্সের ভিজিটারস রুমে বসে এত ভাবছি কেন। পুলকেশ অথবা শীলা কিংবা অমিয়, এরা কি এতই মহান চরিত্র? এদের কথা বারে বারে মনের শূন্যতায় কেন ভেসে উঠছে। শীলা সার্টি-ফিকেট টাইপ করতে যদি দেরি করে, ব্রাউন সই করার আগেই যদি লাঞ্চে চলে যায় তা বলে পার্থ ভিখারির মতো বসে থাকবে। যেমন পুলকেশ বসেছিল দীঘার সমুদ্রসৈকতে শেষ রাতে। চন্দ্রালোকিত সৈকত সমাবেশ তখন ঝাউবনের বেলেল্লাপনায় পরিণত হয়েছে। চাঁদ অস্ত যেতে বসেছে পশ্চিমের ঝাপসা আকাশে। পুলকেশ তোমার স্ত্রী রাখী তখন ছিল ব্রাউনের কোলে, আর তুমি তখন মুখ ঘষছিলে তোমার থেকে অনেক নীচের সমাজের একজন সামান্য স্টেনোগ্রাফার শীলা বিশ্বাসের ঘাড়ে। তোমার স্ত্রীকে তুমি টোপ হিসাবে ব্যবহার করে তুমি অনেক রুই কাতলা ধরেছ, ক্যারিয়ারের ধাপে ধাপে সহজে উঠেছ। রাখীর যৌবন আর তোমার কর্মজীবন অদৃশ্য সুতোয় বাঁধা। পুলকেশ তোমার অনেক চুরির নথীপত্র পার্থ সেন জানে। জানে শীলা বিশ্বাসের সঙ্গে তোমার অনেক ব্যভিচারের কথা। ব্রাউনের প্রবাসজীবনে রাখী, তোমার স্ত্রী, একটি বিশেষ আকর্ষণ। তোমাদের চক্র অসুস্থ ছন্দে ঘুরুক। এই ঘর, এই প্রতিষ্ঠানে জমা থাক মানুষের নিজের হাতে তৈরি সেই সুন্দর নরকের কাহিনী। আপাতত আমি শেষবারের মতো সিঁড়ি ভেঙে নেমে চলি আমার পুরনো কর্মস্থল থেকে।

দিনের ঠিক এই সময়ে এমন হাল্কা মেজাজে মানুষের ভীড়ে মিশে অনেকদিন ঘোরা হয়নি। ব্র্যাবোর্ণ রোড ধরে সোজা ডেলহাউসির চার্চকে ডানদিকে রেখে, লালদীঘির কোল ঘেঁষে চলেছি। সূর্য তখন পশ্চিম আকাশে সোনা ছড়াচ্ছে। এই রাস্তা দিয়ে সাত বছর ধরে যাওয়া আসা করছি; কিন্তু এত অন্তরঙ্গ ভাবে এই জনতার মিছিলে মিশে চারিদিক

এত ভাল করে কোনদিনও দেখা হয়নি। মোটরের পিছনের আসনে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে মাথায় একরাশ চিন্তা নিয়ে নিমেষে চলে যাওয়া আর এই ধীর পায়ে বেড়াতে বেড়াতে মানুষের ধাক্কা খেতে খেতে এগিয়ে চলায় অনেক পার্থক্য।

হঠাৎ মনে পড়ল আজ তো লাঞ্চ খাওয়া হয়নি। কিছু খেয়ে নিলে মন্দ হয় না। রাইটার্স বিল্ডিং-এর কোল ঘেঁষে বিকেলের বেপারীরা বসে আছে। কিছু ফল। কোথাও টোস্ট আর ডিম। বিস্কুট। পান। সিগারেট। একটি ছোটখাটো চলমান রেস্তোরাঁ। মোগলাই পরটা, কাটলেট। ধুলো উড়ছে। কিছু কিছু পথচারী এখনও কেনাকাটায় ব্যস্ত। এখনও অনেক মানুষের জটলা এইসব দোকান ঘিরে। পার্থ সেন রাস্তার ধারের একটা কাটলেট খেয়ে দেখবে নাকি? না, একটু সঙ্কুচিত হচ্ছ। পরিবেশটা ভাল নয়। ট্রিঙ্কা, কিংবা ফ্লুরি, কিংবা ম্যুলারুজের পরিচ্ছন্ন পরিবেশ ছাড়া কোথাও খেতে তোমার ভাল লাগে না। অনেক দিনের অভ্যাস। কিন্তু এখন যারা ঐখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিসঙ্কোচে খেয়ে চলেছে ওরা কারা? চেনো না ওদের। একটু স্বতন্ত্র তাই তো? নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত মানুষের দল। তোমার সেই হাইড্রলিক জ্যাক দিয়ে উঁচু করা প্লাটফর্মের উপর থেকে তুমি এদের দিকে বহুদিন অচেনার দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখেছো। কিন্তু আজ তো তুমি সমতলে নেমে এসেছো। এখন তো এদের চেনা উচিত। এমনও তো হতে পারে জীবিকার জন্যে তুমিই হয়ত বসবে পথের পাশে দোকান সাজিয়ে আর এরাই হবে তোমার অন্নদাতা।

পার্থ সেন যদিও তুমি একটা বেপোরায়া ভাব নিয়ে চলেছ সোজা আপন মনে কিন্তু তোমার পা কাঁপছে। তুমি এখন লক্ষ্য স্থির করতে পারনি। শূন্যতাকে সামনে রেখে ভয়ে ভয়ে হাঁটছ। অনেক চিন্তা অনেক দ্বন্দ্ব তোমার শূন্য মাথায় গিজগিজ করছে। হাজার হাজার বেকার ইঞ্জিনিয়ারদের দলে তুমি আর একটি সংযোজন। তুমি ভাবছ ঠিক এত টাকা মাইনের চাকরি তুমি আর পাবে কিনা? যদি না পাও তুমি কি করবে?

তোমার দায়িত্ব, তোমার জীবনযাত্রার ধরন কি করে বজায় রাখবে। চাকরীর উপর বড় বেশী নির্ভরশীল হয়ে পড়েছ ভাই না?

সেই দীর্ঘদিনের সংস্কার অবশেষে জয়ী হল। পথের 'লাঞ্চ' আর খাওয়া হল না। মিশন রো'র মুখে এসে একটা ঠাণ্ডা কোকাকোলা খেতে খেতে মনে পড়ল অনেক কিছু কেনার কথা ছিল। কাল রাতে আমি আর অপর্ণা বসে বসে ফর্দ তৈরি করেছিলুম। বিবাহবার্ষিকী, আমাদের একমাত্র সন্তান সিদ্ধার্থের জন্মদিন মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে। নিউ মার্কেট থেকে কিনতে হবে পর্দার কাপড়। হবি সেণ্টার থেকে কিনতে হবে কিছু খেলনা। ডি. সি. এম থেকে কিনতে হবে শাড়ি। মহারাজা থেকে স্যুটের কাপড়। তারপর সমস্ত কেনাকাটার শেষে এই পরিশ্রমের পারিশ্রমিক হিসেবে কিনতে হবে ফির্পো থেকে প্যাস্ট্রী আর চকোলেট।

খালি বোতল ফিরিয়ে দিয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম—কিছুই কিনব না। কারণ ঘর সাজানোর প্রয়োজন বোধ হয় হবে না। যে ফ্ল্যাটে আছি তার ভাড়া মাসে চারশো টাকা। বর্তমান পরিস্থিতিতে মাসে মাসে চারশো টাকা ভাড়া দেবার ক্ষমতা আমার হবে না। দ্বিতীয়ত ব্যায়সঙ্কোচ ছাড়া আমি চালাতে পারব না। সুতরাং পুরো ব্যাপারটা আবার পর্যালোচনা করে দেখতে হবে। আপাতত সমস্ত কেনা স্থগিত রইল। এমনকি এই মুহূর্তে নিউম্যানের দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে শোকেসে সাজানো আমার প্রিয় লেখকের লেখা বইখানিও কিনব না। যদিও বই কেনা আমার একটি প্রচণ্ড নেশা।

গ্রেট ইস্টার্নের আর্কেডের তলায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যেতে পারে। ব্রাউন ব্রাদার্সের তকমা এখনও গায়ে ঝুলছে। স্যুটেড, বুটেড। টাই ঝুলছে গলায়, ফাঁসির দড়ির মতো। 'জোডিয়াক', 'জোডিয়াক'। এখানে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট খেতে খেতে ভেবে নেওয়া যেতে পারে পার্থ সেনকে এবার কিভাবে পরিচালিত করা হবে। তাকে একটা ট্যাক্সি চাপিয়ে সাত সকালে বাড়ি পাঠানো হবে। অথবা পাশেই ওয়াটার্লু'তে বার অ্যামবারে বসিয়ে তাকে কয়েক পেগ জিন খাওয়ানো হবে—লাইম

কর্ডিয়েল দিয়ে। অথবা তাকে কালিঘাটে মায়ের মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হবে সুফলের আশায়। সময় কাটানো যে এত সমস্যা হয়ে উঠবে আগে কখনও ভাবিনি। গ্রেট ইস্টার্নের দরজা দিয়ে জনৈকা উদীয়মানা চিত্রাভিনেত্রী অতিরিক্ত মদ্যপানে বেসামাল হয়ে একটি পাঞ্জাবী যুবকের কণ্ঠলগ্না হয়ে টলতে টলতে বেরিয়ে এলেন। পাঞ্জাবী যুবক অতি যত্নে তাকে একটি নতুন চকচকে ওপেল গাড়ির, পিছনের সিটে বসিয়ে দিয়ে, নিজে চালকের আসনে বসে হুস্ করে বেরিয়ে গেল. বোধহয় কোন উদীয়মান ব্যবসায়ী। এসব চরিত্র আমার খুব চেনা। কত আর, দিনে হাজার-খানেক টাকার বাজেটে এই রকম কিছু মজা লোটা যায়? একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী রাম অবতার সিংহানিয়া আমাকে তাঁর সদ্য নির্মিত নিউ আলিপুর বাড়িতে একটি আধুনিক কায়দায় সাজানো ড্রয়িং রুমে বসে, সিদ্ধির সরবত খেতে খেতে বলেছিলেন—সেনসাব একটা ব্যবসা করুন। ভদ্রলোক ছ'মাস ভারতবর্ষে, আর ছ'মাস কন্টিনেণ্টে থাকেন। বেশ রসিক মানুষ। বিদেশে ঘোরার ফলে আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির কিছু হাওয়া গায়ে লেগেছে। বাড়িটি হালফ্যাসানের। সাজাবার ধরনটিও ইন্টারন্যাশানাল।

কিসের ব্যবসা আমি আর ভয়ে জিজ্ঞেস করিনি। কারণ আমি জানি ভদ্রলোক আমাকে কিছু সদুপদেশ দেবেন। ঘণ্টাখানেক ধরে নিজের সাফল্যের কাহিনী শোনাবেন। মাঝে মাঝে আমাদের মতো শিক্ষিত বেতনভোগী মানুষদের জন্যে করুণার বন্যা বইয়ে দেবেন। কিন্তু সেই ট্রেড-সিক্রেটটি কিছুতেই বলবেন না। সেই গোপন রহস্য। ভারতবর্ষের মতো করভারপীড়িত দেশে কিভাবে কোটি কোটি টাকার গদীর ওপর সুখে গড়াগড়ি দেওয়া যায়। সর্বস্তরে কিভাবে শোষণ চালালে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠা যায়। কতটা আত্মকেন্দ্রিক হলে শুধুমাত্র নিজের আর নিজের পরিবারের মানুষদের কথাই কেবল ভাবা যায়! সিংহানিয়ার দুই ছেলে আর এক মেয়ে বিদেশে। বাকি সবাই ভারতবর্ষের মতো দরিদ্র দেশে ভোগ আর বিলাসে লুটোপুটি খাচ্ছে।

সিংহানিয়া বা ঐ পাঞ্জাবী যুবকের মতো পার্থ সেন যদি একজন শিল্পপতি হত, তাহলে, ঠিক এই রকম নিশ্চিন্তে, দিনের এই সময় গ্রেট ইস্টার্ন আর্কেডে দাঁড়িয়ে থাকতে পারত কি? রাতে তার বিবাহিত স্ত্রী অপর্ণাকে কি পানসে মনে হত না? সেই একই নারীদেহ তবুও কোনো চিত্রতারকা, নিদেন কোনো ডাকসাইটে গণিকাকে বিলিতি মদ গিলিয়ে কোনো প্রাইভেট ফ্ল্যাটে প্রায়শই অসুস্থ রাত কাটাবার প্রয়োজন অনুভব করত। জীবনের একঘেয়েমি, ব্যবসার একঘেয়েমি, সবশেষে রাশি রাশি টাকার একঘেয়েমি ভুলতে এইসব উত্তেজনার আশ্রয় নিতে হয়। পৃথিবীর সমস্ত সম্পর্ককে,সমস্ত মানুষকে অসৎ করে তোলার,'করাপ্ট'করে তোলার মধ্যে একটা বৃশ্চিক দংশনের মতো জ্বালাদার আনন্দ আছে। টাকা যেন কোকেনের নেশা। আসক্তি বাড়তেই থাকে। সরকারী কর্মচারীদের ঘুষ দিয়ে, পরস্ত্রীকে তার সুখের সংসার থেকে লোভ দেখিয়ে বের করে এনে, গণিকাদের সংখ্যা বাড়িয়ে, সমস্ত প্রতিষ্ঠানের পবিত্রতা নষ্ট করে সারা গায়ে ব্যাঙের গুটি নিয়ে এক-একটি বিরাট যক্ষ যেন হাসছে। কেবলই বোঝাতে চাইছে আমরা ভীষণ সুখী।

ট্রাম আর বাসগুলো আকণ্ঠ মানুষ বোঝাই করে চলেছে। অফিস ছুটি হয়েছে। এখন ঘণ্টা দুয়েক আর কোনো কিছুতেই পা দেওয়া যাবে না। সিগারেট শেষ হয়েছে। আপাতত আর্কেড ছেড়ে এগোনো যেতে পারে। এখনই হয়ত পরিচিত কোনো পাপীর সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। যাঁরা দিনের আলো নিভে গেলেই মন খারাপের ভয়ে তরল পদার্থে একটু মানসিক শক্তি খুঁজে বেড়ায়।

আমার এখনও মাঝে মাঝে প্রবীরের কথা মনে পড়ে। গত বছর সিরোসিস অফ লিভারে মারা গেছে। সে নাকি কোনো একদিন ভিড়ের মধ্যে একটি মেয়েকে দেখেছিল। হঠাৎ চোখাচোখি। সে চোখ নাকি জীবনে ভোলা যায় না। সে মুখের জন্যে নাকি দেশত্যাগী হওয়া যায়। সেই যে প্রবীরের মন খারাপ আরম্ভ হল। সব সময় যেন মন কেমন কেমন করছে! মনের আকাশে অনবরতই বৃষ্টি পড়ছে। বাদলা দিনের

ঝাপসা অন্ধকার। ট্রেন চলে যাওয়ার হু হু শব্দ। অতিরিক্ত রোমান্টিক হলে যা হয়। প্রবীর মদ গিলে গিলে, মদের গ্লাসে নাকি সেই মুখের ছায়া দেখত, সিরোসিস অফ লিভারে মারা গেল।

আপাতত গ্রেট ইস্টার্নের কাউন্টারে দাঁড়িয়ে কিছু খাওয়া যেতে পারে। প্যাটিস অথবা প্যাসট্রি কিংবা ক্রিমরোল। ফেলে দেওয়া ঠোঙা থেকে খাবারের ভাঙা টুকরো খুঁটে নেবার জন্যে ফুটপাতের ছেলেদের মধ্যে কি ভীষণ কাড়াকাড়ি। অনেক আগে জীবন যখন শুরু করিনি। জীবন সম্পর্কে যখন ভীষণ একটা সংশয় ছিল তখন মনে হত জীবনকে যদি সমস্ত প্রকার পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়াতে পারি তাহলে আর ভয়ের কিছু থাকে না। তখন মাথার উপর ছাদ আর নীল আকাশে কিছু তফাত থাকে না, তখন সুকোমল শয্যা অথবা শক্ত পাথরে কিছু যায় আসে না। তখন সকালে ব্রেকফাস্ট, দুপুরে লাঞ্চ কিংবা রাতে ডিনারের বদলে যে কোনো রকম ব্যবস্থাই হাসি মুখে গ্রহণ করা চলে। আর ঠিক তখনই জীবনে পুরোপুরি স্বাধীন হওয়া যায়, নির্ভীক হওয়া যায়, বেপরোয়া হওয়া যায়। এই রকমই কোন এক মানসিক অবস্থায় আমি ছাত্রজীবনে একবার মধ্য কলকাতার কোন এক ফুটপাতে রাত কাটিয়েছিলাম। প্রথমে ভয় ছিল হয়ত ফুটপাতের কোনো প্রকৃত বাসিন্দা এসে আমাকে হটিয়ে দেবে। জায়গাটা ছিল এ. সি. মহম্মদ আলীর দোকানের সামনে বেন্টিক স্ট্রীট আর মিশন রো'র সংযোগস্থল। একটা প্লাস্টিকের চাদর বিছিয়ে ইঁট মাথায় দিয়ে শুয়েছিলুম। প্রথমে একটা নেড়ি কুকুর এসে দু-একবার শুঁকে চলে গেল। তারপর একটা রাস্তার ছাড়া গরু মাথার কাছে এসে মূত্রত্যাগ করে চলে গেল। শেষে রাত এগারটা নাগাদ এক বৃদ্ধ পেশোয়ারী মুসলমান এসে একটু দূরে বিছানা বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। বৃদ্ধের সঙ্গে একটু বেশী রাতে আলাপ হয়েছিল। তপ্ত কাঞ্চনের মতো চেহারা, সাদা গোঁফদাড়ি। গিলে করা সাদা পাঞ্জাবি, নীল কল্কা তোলা লুঙ্গি। শোবার আগে বৃদ্ধ একটু নামাজ পড়ে নিয়েছিল। তারপর এমন নিশ্চিন্ত আরামে শুয়েছিল, আমার

মনে হচ্ছিল সে যেন কোনো প্রথম শ্রেণীর হোটেলে, পালকের গদীতে নিভৃত আরামে শুয়ে আছে। শেষ রাতের ট্রাম চলে গেল। রাস্তা ক্রমশই জনবিরল হয়ে আসছে। রাত বারোটায় ওরিয়েণ্ট সিনেমা থেকে একদল নরনারী বেরিয়ে জায়গাটাকে শেষবারের মতো কোলাহলমুখর করে বাকি রাতের জন্য নিস্তব্ধতার কোলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেল। সবশেষে এল দুটি মাতাল। তারা গালাগাল দিতে দিতে টলতে টলতে চলে গেল। গণেশ অ্যাভিনিউ-এর দিক থেকে একটা ফুরফুরে হাওয়া উঠল। মহম্মদ আলি ম্যানসনের কোনো একটি তলা থেকে হাল্কা ঘুঙুরের আওয়াজ ভেসে আসছিল। রাতের এমন সুন্দর রূপ আমি কখনও দেখিনি। কিছু দূরে একটি টানা রিকশাওলা অঘোরে ঘুমচ্ছিল। ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের গঙ্গার উপর থেকে ভেসে আসছিল স্টিমারের ভোঁ। ঘুম আসছিল না কিছুতেই। এমন সময় একটা চকচকে মোটর এসে দাঁড়াল। দরজা খুলে একজন সুন্দর যুবক বেরিয়ে এলেন। নেমে একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে সোজা ফুটপাতের যে অংশে সেই বৃদ্ধ মুসলমান শুয়েছিলেন সেই দিকে এগিয়ে এলেন। বৃদ্ধকে ঘুম থেকে তুলে নমস্কার করলেন। যুবক বৃদ্ধের ছেলে। সেই রাতে বৃদ্ধর মুখ থেকে পরে যে কাহিনী শুনেছিলুম তা প্রকৃতই অদ্ভুত।

ছেলে জনৈকা বাঙালী আধুনিকাকে বিয়ে করেছেন। সেই মহিলা কিছুতেই বৃদ্ধ শ্বশুরকে বরদাস্ত করতে পারেন না। বৃদ্ধের তাতে কোন অভিযোগ নেই। তোমরা সুখী হও। আমার দিন তো শেষ হলই। আল্লা যখন ডাক দেবেন তখনই আমি প্রস্তুত। জীবনে ভোগ তো কম হল না। আর কেন, এবার সব ছাড়ার পালা। বৃদ্ধ সারাদিন রাস্তায় ঘুরে রাতে এইখানেই আসেন শুতে। লক্ষপতির শয্যা এই ফুটপাত। বৃদ্ধ বলেছিলেন তোমাদের তুলসীদাস কি বলেছে জান বেটা—সব ছাড়োয়ে সব পাওয়ে। সব ছাড়লেই সব পাওয়া যায়। ছেলের সমস্ত অনুনয় বিনয় ব্যর্থ হয়েছে। তাই সে রোজ মধ্যরাতে আসে পিতার আশীর্বাদের আশায়। সে রাত আমার কেটেছিল বৃদ্ধের জীবন কাহিনী শুনতে শুনতে।

ফুটপাথ থেকে হাত তুয়েক ব্যবধানে দাঁড়িয়ে ক্রীমরোল খেতে খেতে জীবনের সেই একটি ফুটপাথ রজনীর কথা মনে পড়ে গেল। ফুটপাথে যারা সংসার পেতেছে তারা আমারই মত মানুষ, একই পৃথিবীর অধিবাসী কিন্তু আমাদের জগৎ, বেঁচে থাকার ধরন সম্পূর্ণ আলাদা। আমরা নানা প্রয়োজন দিয়ে জীবনকে বেঁধেছি, জীবনকে জটিল করে তুলেছি। কিন্তু এরা বহু প্রয়োজনকে ছেঁটে ফেলেছে। জীবনকে দাঁড় করিয়েছে তুটি কি তিনটি প্রয়োজনের উপর। তুলনায় এই সমস্ত মানুষের সংখ্যাই হয়ত ভারতবর্ষে বেশী। এদের শিক্ষা, সংস্কৃতিকে যদি ভারত-সংস্কৃতি বলে চালানো হয়, এরা যে ভাষায় কথা বলে তাকেই যদি জাতীয় ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয়, ভাবা যায় না। আমার ছেলে সিদ্ধার্থকে যে ভাবে মানুষ করছি, তাতে সে পুরোপুরি ভারতীয় বোধহয় নাও হতে পারে। তার রুচি হবে মার্জিত। তার সংস্কৃতি চালচলন হবে মাজা ঘষা। সে হবে সৌখীন, কিছু বিলাসী। যে কোন পরিবেশ তার প্রীতিকর হবে না। জীবনের যে 'র ফর্ম' আমরা তুপাশে দেখছি সিদ্ধার্থ হবে তার সম্পূর্ণ বিপরীত। আদর্শ কি তাহলে একটি আপেক্ষিক শব্দ ?

এই ভাবতে ভাবতেই চলে এসেছি মেট্রোর তলায়। কি বই চলছে ? 'সান ফ্লাওয়ার'। হঠাৎ সিগারেটের দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি মাজা চেহারার নীল শাড়ি জামা পরা মহিলা আস্তে আস্তে বলে — যাবেন নাকি ? চমকে উঠলাম—কোথায় ? কোথায় যাবার কথা সে বলছে ? বলছে—সিনেমায়, নাহয় কোন রেস্তোরাঁয়, অথবা ময়দানে কিংবা কোন ট্যাক্সি নিয়েও খানিক বেড়িয়ে আসা যায়, রেড রোড ধরে, ভিক্টোরিয়াকে বাঁয়ে রেখে রেস কোর্সকে পাক দিয়ে সোজা স্ট্র্যাণ্ড রোড বরাবর।

অনেকেই হয়ত এই রকম বেড়াতে যায়। তাদের স্ত্রীরা যখন জানলার গরাদে মাথা রেখে স্বামীর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে তখন তারা হয় সিনেমায়, নয় রেস্তোরাঁয়, অথবা ট্যাক্সির পিছনের সিটে। পকেটে হয়ত প্রেসক্রিপশান, ওষুধ কেনা হয়নি। ছেলে অথবা মেয়ে জেগে বসে আছে বাবা

ফিরবে। মা হয়ত ভাবছেন ছেলে আসছে না কেন? তারা তখন পাক খাচ্ছে গোল হয়ে। কাঁধের উপর মাথা রেখেছে রুক্ষ চুল ঘষা ঘষা চেহারার একটি মেয়ে। কিছু অশ্লীল রসিকতা, একটু নগ্নতা। জীবন যে সার্থকতায় ভরে উঠছে। না সুন্দরী, আমি পার্থ সেন তোমার খদ্দের হতে পারছি না। অপর্ণা নামক তোমারই মত একটি মেয়ে আপাতত দক্ষিণের বারান্দায় আমার পথ চেয়ে বসে আছে। যদিও আমি একটা দুঃসংবাদ নিয়ে চলেছি। জানি না সে কি ভাবে নেবে!

আসা-যাওয়ার পথে তোমাদের মত চরিত্র আমি আগেও দেখেছি। তোমাদের প্রতি আমার কোন লোভ নেই, আছে অপরিসীম শ্রদ্ধা। জীবন থেকে ফুলের স্বপ্ন তোমরা ঝেড়ে ফেলে দিয়েছ। মরুভূমির স্বাদ নেবার জন্যে তোমরা নিজেদের প্রস্তুত করেছ। তোমরা কি জীবনে স্বাবলম্বী! তোমাদের কেউ স্নেহ করে না, নিজের বলতে তোমাদের কেউ নেই। এই ভীষণ শহরে তোমরা সাহসে বুক বেঁধে একলা বেরিয়ে পড়েছ। জীবনমৃত্যুর সঙ্গে দুবেলা পাঞ্জা লড়ছ। এই মেট্রোর তলায়, এই রাতে আমার স্ত্রী অপর্ণাকে একলা ছেড়ে দিলে, সে কি করত? ভয়ে দিশাহারা হয়ে যেতো। এরপর যদি কোন অপরিচিত মানুষ তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চাইত, তাহলে তো কথাই নেই। অথচ তোমরা এমনি কত ভীষণ ভীষণ মানুষকে নিয়ে অনায়াসে খেলছো। যেখানে গোলমাল দেখছো, সেখানে সাপের মত ছোবল দিয়ে প্রতিপক্ষকে কাবু করছ। জীবনকে তোমরাই ঠিক ঠিক চিনেছ, জগৎকে তোমরাই ঠিক দেখেছ।

কাফে ডি মনিকোর সামনে দেখি বিভাস দাঁড়িয়ে। অনেকদিন পরে দেখা। আইনের ব্যবসায় চুল পাকিয়েছে। হাতে ব্রিফ কেস। চলমান জনস্রোতে একটা অনড় খুঁটির মতো দাঁড়িয়ে। বিভাসচন্দ্রের খবর কি? যেন কোনো রাজ্যে চলে গিয়েছিল। দেহটা ছিল ফুটপাথে, মন বিচরণ করছিল কোথায় কোন জগতে কে জানে? চমকে উঠল। প্রথমে চিনতে পারেনি তারপর—আরে পার্থ যে রে! বলে এমন সোরগোল তুলল, আশে-পাশের অপেক্ষমান মানুষেরা চমকে উঠল।

বিভাসচন্দ্র তোমার এই সময়ে এখানে দাঁড়িয়ে থাকার অর্থ কি ? তোমার যে পেশা তাতে তো তোমার এক মিনিট সময়ও নষ্ট করা চলে না। সদা মক্কেল পরিবৃত,আইনের বইয়ের পাতায় পোকার মতো বিচরণ, এই তো তোমার পরিচিত চেহারা। মেট্রোর তলায় কারা দাঁড়াবে ? দাঁড়াবে প্রেমিক, প্রেমিকা, গণিকা, স্মাগলার, ব্ল্যাকমেলার, বাসযাত্রী, রেস্তুড়ে, নিষ্কর্মা, ভবঘুরে।

বিভাসচন্দ্র বলল অকারণে নয়—ঐ দ্যাখ। উল্টোদিকের ফুটপাথে গাছের তলায় একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। মোটামুটি সুশ্রী। নারীঘটিত ব্যাপার। ঠিক ধরেছিস। ভদ্রমহিলা একজন প্রখ্যাত কর্মাশিয়াল আর্টিস্টের স্ত্রী। ডিভোর্স মামলা ঝুলছে। ভদ্রমহিলাকে বাগে আনার চেষ্টা করছি। যদি ওঁর চরিত্রে একটা ফাটল আবিষ্কার করতে পারি আমার মক্কেল একটা ক্লিন ডিভোর্স পেয়ে যাবে।

বিভাসচন্দ্র, সব সহ্য হয়, সহ্য হয় না উকিলের গোয়েন্দাগিরি। এইসব কাজের জন্য অন্য একদল লোক আছে। বিভাসের হাত ধরে টানতে টানতে 'অশোকা'য় নিয়ে গিয়ে তুললুম। 'করিস কি,' 'করিস কি' ? আর করিস কি ! তোমার গোয়েন্দাগিরি আপাতত শেষ। কার একটা বউ গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছে ! কে কখন আসবে ! আসুক না, ক্ষতি কি, তারপর কোথাও গিয়ে বসবে। এই জগতের তুমি, আমি, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, এপিডেমিক, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধবিগ্রহ, বেকারসমস্যা, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা সব ভুলে ঘণ্টাখানেক, ঘণ্টা দুয়েক একটা অন্য জগতে চলে যাবে। যাক না। নিজের স্ত্রী তো রইলই, নিজের স্বামী তো আছেই, তাদের সমস্ত অভাব অভিযোগ দাবীদাওয়া নিয়ে টানটান হয়ে। কেন বাবা কারুর সুখে বাগড়া দিচ্ছ।

বয় ! দুটো কাটলেট, দু'কাপ চা। চা না কফি ? কফি। বেশ দুটো এস্প্রেশো। তারপর বিভাস ! পেশা ভাল চলছে না। ঠিক কিনা। চললে তুমি শ্লা এই ছুটকো কেস নিতে না ? কম্‌পিটিশান খুব বেশী। তা তো হবেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা গলে প্রতি বছর রাশি রাশি ছেলে

বেরোচ্ছে। সেই যে ওরা কি যেন বলে, হেঁকে হেঁকে নেচে নেচে—'বাঁচতে গেলে লড়তে হবে, এ লড়াই বাঁচার লড়াই'।

বিভাসকে কাটলেট চিবোতে চিবোতে আমার কেসটা খুলে বললুম। কোন লিগেল অ্যাকশান নেওয়া যেতে পারে? পারে। বেশ। খরচ? মোটা খরচ। চলবে, অনেকদিন ধরে লড়তে হবে। রেজাল্ট। পুনর্বহাল, অর্থপ্রাপ্তি অথবা শূন্যযোগ। তোর কি সাজেশান? লেগে যাবো। আর তোমাকে আজই কিছু অ্যাডভান্স করব? এক পাল্লায় বন্ধুত্ব, অন্য পাল্লায় টাকা। টাকার দিকেই ঝুঁকতি বেশী। ভেরী গুড।

বিভাস যেন মাঝে মাঝে কেমন আনমনা হয়ে যাচ্ছে। মুচমুচে কাটলেট, গরম কফি কোন কিছুই যেন তাকে চাঙ্গা করতে পারছে না। অবশেষে বিভাস ভেঙে পড়ল। পার্থ, ওই ভদ্রমহিলা অন্য কেউ নয় আমারই স্ত্রী। আমি ভাই একেবারে ভীম গাড্ডায় পড়েছি। বর্তমানে আমি গৃহত্যাগী। বিভাসের কাহিনী, প্রবৃত্তির কাছে মানুষের আত্ম-বিক্রয়ের কাহিনী। বিভাসের বর্তমানে দুটি বিবাহ। প্রথম স্ত্রী গাছতলায়, কার অপেক্ষায় কে জানে। বিভাস কালীঘাটে থাকে না। সে এখন নাকতলাবাসী। বিভাসের মুহুরীর মেয়ে তার দ্বিতীয় স্ত্রী। বিভাসের প্রথম স্ত্রী কেস করেছে। বিভাস প্রমাণ করতে চাইছে তার প্রথম স্ত্রী চরিত্রহীনা।

বিভাস বলল—ভাই ভীষণ ফাঁদে পড়েছি। মুহুরীটা খুব কায়দা করে আস্তে আস্তে টোপ গিলিয়েছে, এখন তার ছিপে বড় মাছ। বেশ খেলিয়ে খেলিয়ে তুলছে। তুমি টোপ গিললে কেন? আরে মাছের স্বভাবই তো টোপ গেলা। তা হলে আর দুঃখ কেন? আসলে কি জানিস আমার দ্বিতীয় স্ত্রী মালাই চরিত্রহীন। তার চারে এখন অনেক মাছ, আমাকে তুলেছে, বাকিগুলোকে খেলাচ্ছে। টোপ হল তার ভয়ঙ্কর যৌবন।

আইনের বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে জীবন যখন নীরস ঠিক তখনই ঐ বুড়ো মুহুরীর মেয়ে সোনালী মদের মত গ্লাস গ্লাস উত্তেজনা নিয়ে জীবনটাকে পুড়িয়ে দিলে। আমি এখন নিরুপায়। আমার কেরিয়ার

যেতে বসেছে। আমি এখন একটা গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার। আত্মহত্যা ছাড়া আমার আর কোন মুক্তির উপায় নেই।

মুক্তির উপায়, মুক্তির উপায়। গান গাইতে গাইতে আবার এগিয়ে চলেছি। বিভাস এখনএকটা ভীড় বাসে চিঁড়েচেপ্টা হয়ে তার নাকতলার খোঁয়াড়ে চলেছে। সে এখন একটা প্রচণ্ড শরীরের শিকার। বেশ নেশাদার, বেশ জ্বালাদার। মাতাল মদ না পেলে যেমন পাগল হয়ে যায়, বিভাসের বর্তমান অবস্থাও তাই। যে আশায় সে একটা হীন রুচির মহিলার কাছে নিজেকে বিক্রী করেছিল, সেই আশা এখন গাধার নাকের সামনে মূলোর মতো ঝুলছে। বিভাস চলেছে, চলেছে। বিভাসের সুখের সংসারে আগুন লেগেছে।

হঠাৎ মনে হল আমি দিব্যদৃষ্টি লাভ করেছি। আমার আশপাশ দিয়ে যে সমস্ত মানুষ এদিক ওদিক দৌড়োচ্ছে, আমি যেন তাদের ভিতরটা স্পষ্টদেখতে পাচ্ছি। এক একটি চলমান অ্যাকোয়ারিয়াম,ভিতরে নানা রঙের মাছ কিলবিল করছে, ছটফট করছে। ঐ সব নানা প্রবৃত্তি। সখ করেই যেন জিইয়ে রাখা হয়েছে, খাবার দিয়ে তোয়াজ করে। জীবন যেন সেই বিষাক্ত সাপ, আমরা জিভ এগিয়ে দিয়ে একটি করে ছোবল খাচ্ছি আর নেশায় বুঁদ হয়ে পড়ে থাকছি। হায় জীবন!

কিন্তু আমি চলতে চলতে কোথায় এসে পড়েছি।

চাঁদনি চৌক। বাবা! অনেকদিনপরে আসা হল এদিকে। পার্ক স্ট্রীট, চৌরঙ্গী, থিয়েটার রোড, ফ্রী স্কুল স্ট্রীট এইসব জায়গাতেই ঘোরাঘুরি সীমারব্ধ ছিল। আয় অনুসারে মানুষ যেমন বাসস্থান নির্বাচন করে, সেই সঙ্গে কি তার বিচরণের জায়গাও নির্ধারিত হয়! হয়ত হয়। বড়-লোক পাড়া, গরীব পাড়া, মধ্যবিত্ত পাড়া ইত্যাদি। রাত এখন সাতটা। চাঁদনীতে অজস্র মানুষের ভীড় বেশীর ভাগই ভাসমান মানুষ। অফিস ভাঙা বাড়িমুখো মানুষের দল। ধর্মতলার মুখ থেকে এদিকে ঠেলে এসেছে খালি যানবাহনের আশায়। রাস্তা জুড়ে মুসলমান বেপারীর দল। সিনেমা হলের সামনে কিছু জটলা। কিছু কিছু প্রমোদবিহারী।

মতিশীল স্ট্রীটের মুখে আর একটি শ্যামবর্ণ মেয়ে কোনো রেস্তোরাঁয় দু দণ্ড বসার পরামর্শ দিল। কিন্তু পার্থ সেন আবার প্রত্যাখ্যান জানাল। না সে আজ একলা বেড়াবে।

চাঁদনীতে যখন এসেছি, তখন একবার আমার সেই দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করে গেলে কেমন হয়। চার নম্বর গেটের মধ্যে ঢুকে সোজা এগিয়ে যেতে হবে, তারপর বাঁ দিকের একটা সুঁড়িপথ ধরে কিছুদূর এগোলেই দুটো বড় বড় দোকান। কিসের দোকান? বেডিং, স্প্রীং, ম্যাটরেস, ছোবড়া ইত্যাদি। ৪৬ সালের দাঙ্গা কিছু কিছু মানুষের ভাগ্য ফিরিয়েছিল। আমার এই আত্মীয়টি তাদের অন্যতম। এক মুসলমানের কাছ থেকে নামমাত্র মূল্যে এই দোকান দুটো কিনে চড়চড় করে ভাগ্যের সোজা সড়ক ধরে এগিয়ে চলেছে। দেশের জমিতে আধুনিক প্রথায় চাষ হচ্ছে। সামান্য মাইনের চাকরি ছেড়ে দিয়ে সব কটি ভাই এখন ব্যবসায়ে আর চাষবাসে। আমাকে কেন, এরা এখন দশ-বিশটা ব্রাউনকে কিনে ফেলতে পারে।

আমাকে দেখে একটু অবাক হবে। ভাববে কিছু ধান্দা করতে এসেছি। হয়ত ভাববে টাকা ধার করতে এসেছি। তবুও একবার যাব। নিজের অহঙ্কারকে খর্ব করার জন্যে। কে বলতে পারে, দিনকতক পরে হয়ত আমাকে ফেরি করতে বেরোতে হবে। সংসার তো আমাকে ছাড়বে না, চাকরি হয়ত আমাকে ছেড়েছে। সকাল বেলা পার্থ সেন, অপর্ণা সেন আর সিদ্ধার্থ সেন তিনটে পাখীর মতো হাঁ করে যখন খাব খাব করবে, তখন তো আর নিশ্চেষ্ট বসে থাকা যাবে না। হাটে নামতে হবে ঝোলাঝুলি নিয়ে।

বিষ্টুদা তখন টেলিফোনে লাখ পঞ্চাশ করছিল। আমাকে হাত নেড়ে ইশারায় বসতে বলল। বেশ মোটা হয়েছে, যৌবন যেন ফিরে এসেছে। হাসি হাসি মুখ করে সেই একই রকম অভ্যর্থনা, যেন আমিও এক খদ্দের। সেই ফর্মুলায় বাঁধা ভদ্রতা, একটা কোকাকোলা, খুব একটা ঠাণ্ডা নয়। সেই কুশল প্রশ্ন, এ কেমন, সে কেমন, অমুক কেমন, তমুক

কেমন। মাঝে মাঝে ফোন। জীবনটা যেন কেমন যান্ত্রিক। অনুভূতিহীন একটা ব্যাপার। মুখ থেকে কথাগুলো কেড়ে নিলে, মনে হবে যেন নির্বাক চলচ্চিত্র দেখছি। আমি একটু আশার আলো দেখতে চেয়েছিলুম, ভেবেছিলুম, কোন ব্যবসার খবর নেব কিংবা চাষবাসের। ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি বাণিজ্যেই লক্ষ্মীর বাস। ভেবেছিলুম বিষ্টুদার পরামর্শে যে কয়েক হাজার টাকা পাব ব্যবসাতেই খাটাব। খাটতে পারি শুধু তাই নয় একটা প্রথম শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানে এক সময় সেলস্ একজিকিউটিভ ছিলুম। কিন্তু বিষ্টুবাবুর ভাব দেখে বিশেষ কোন অন্তরঙ্গ কথা বলার উৎসাহ পেলুম না। উঠি তা হলে আজ।

কিন্তু কি জন্যে এসেছিলে! কেন আসতে নেই! না না সে কি কথা, আবার এস পার্থ।

পার্থ আর আসবে না। পার্থ বুঝেছে মানুষ আর মানুষকে চায় না। মানুষ এখন একলা থাকতে চায়। কেবল কাজের সময় অন্য মানুষকে মনে পড়বে। ছেলেবেলায় মা ছড়া কাটতেন—ওরে শয়তান কাজের সময় কাজি, কাজ ফুরোলেই পাজি। কোন এক কবি সাম্প্রতিক কালে লিখেছেন, বোধহয় কোন সাহিত্য পত্রিকায় পড়েছি—

'আমি মানুষ বড় ভালবাসি
আমার ক্ষেতে তাদের ঘাম ঝরে
আমি তুলি সোনার ফসল
আমার গোলাঘরে থরে থরে
আমি মানুষকে জুড়েছি যন্ত্রে
ক্ষেতে খামারে, আমার গৃহকর্মে
মানুষ ছাড়া আমি পারি না থাকতে
মানুষ ছাড়া আমি পারি না বাঁচতে
আমি মানুষ ভালবাসি নিজের কারণে
আমি মনুষ্যদরদী এক মহাশয়তান'

চাঁদনী থেকে বেরিয়ে দৌড় দৌড়। সোজা ময়দানের দিকে গ্রান্ট

স্ট্রীট দিয়ে করপোরেশনের বাড়িকে বাঁয়ে রেখে সুরেন ব্যানার্জি রোড ধরে মনুমেন্টের তলা। আর না, আর ঘোরাঘুরি নয়। এবার ঘাসের উপর হাত পা ছড়িয়ে দিয়ে একটু বসব। একটু চিন্তা করব। কি ঘটল, কি ঘটতে চলেছে।

জীবন শুরু করেছিলুম কবে সেই কোন সকালে। হলুদ রঙের ভূর্জপত্রে সংস্কৃতে লেখা হয়েছিল, শুভলগ্নে, শুক্লপক্ষে, অমুকস্য পুত্র জাতবান। চারটে লাইন ইংরেজী প্লাসের মতো, অনেকটা কাটাকুটি খেলার ঘরের মতো, কোনো খোপে লং, কোনো খোপে বৃ, শু, শ, কে, চ, ম। ঐ তো মাথার উপর গাঢ় কালো আকাশে গ্রহনক্ষত্রের ফুল ছড়িয়েছে। নীচে মাঠে বসে আছে পার্থ সেন অমুকস্য পুত্র। অত দূর থেকে পার্থ সেনের ভাগ্য নিয়ে খেলছে গুটিকতক গ্রহ। আরে মশাই আপনার ভাবনা কি ষষ্ঠে মঙ্গল, শত্রুনাশ, একাদশে শনি, রাহু—টাকা মশাই পায়ে হেঁটে সিন্দুকে ঢুকবে। আর, অষ্টমে শুক্র, তন্বী, শ্যামা, শিখরী দশনা, বিদুষী ভার্যা। মশাই রাজার কোষ্ঠী।

চা দেবো বাবু, আদ্রক দেওয়া। ঝাল, মুড়ি, বাদাম। কল্যাণ, তুমি ভারি দুষ্টু, সুড়সুড়ি লাগছে না। পাশে, খুব কাছে একটি ছেলে, একটি মেয়ে, সেই চিরন্তন জুটি। ঐ অনন্ত আকাশ সাক্ষী, মিনতি আমি তোমায় ভালবাসি। যাও যাও, ওরকম অনেক শুনেছি, তোমরা ছেলেরা মশাই, ভ্রমরের জাত, ফুলে ফুলে মধু খাও। মাইরী বলছি তুমি ছাড়া জীবন অচল, তুমি আমার ধ্রুবতারা, নয়নতারা।

গঙ্গার দিক থেকে ভিজে ভিজে হাওয়া আসছে। চৌরঙ্গীর আকাশে নিয়নের আলো কাঁপছে। জোড়ায় জোড়ায় আবছা মূর্তি ময়দানের এখানে ওখানে বসে আছে। হঠাৎ যেন নিজের কাছে ধরা পড়ে গেলুম। আমি বাড়ি না গিয়ে সারাটা দিন এদিক ওদিক সেদিক ঘুরে বেড়িয়েছি। এখন আটটা পাঁচ, আমি ময়দানে বসে, ভাঁড়ে চা খাচ্ছি। ওদিকে আমার সুসজ্জিত ফ্ল্যাটে, অপর্ণা সেজেগুজে, সারাগায়ে মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে হয়ত রেডিওগ্রামে তার প্রিয় শিল্পীর কোনো গান শুনছে। রান্নাঘরে

কুকিং রেঞ্জের উপর প্রেসার কুকার মুরগীর মাংসের সুগন্ধ ছড়াচ্ছে। খাবার টেবিলে পরিচ্ছন্ন ফুলতোলা টেবিলক্লথ বিছানো হয়েছে। মাঝখানে ফুলদানীতে ইকেবানা প্রথায় ফুল সাজানো হয়েছে। ফ্রুট বোলে ফল সাজানো হয়েছে। ফ্রিজে জমছে পেস্তার কুলফী। সিদ্ধার্থ তার বড় পুতুলটা নিয়ে এই মুহূর্তে হয়ত তার কটে বসে খেলছে। অপর্ণা উৎকর্ণ হয়ে আছে—গাড়ির শব্দ পেলেই চমকে উঠছে—পার্থ এল। পার্থ কিন্তু আজ তোমাকে স্টান্ট দেবে। কখন নিঃশব্দে সে সিঁড়ি ভেঙে তোমার পিছনে গিয়ে দাঁড়াবে তুমি টের পাবে না, চমকে উঠবে।

পার্থ তখনই তোমাদের কিছু বলবে না। যথারীতি সে ফ্রিজ খুলে একটা কোল্ড ড্রিংকস খাবে। সোফায় বসে একটা ইংরেজি ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাবে। তারপর চলে যাবে বাথরুমে। শাওয়ারে শরীর ভেজাতে ভেজাতে ভাববে, এই বিলাস আর কদিন। তারপর সে সেতার নিয়ে একটু টুং টাং করবে। তারপর সকলে মিলে খাবার টেবিলে চৌকো হয়ে বসে রুটি, মাংস খাবে। অবশেষে কেশে গলা পরিষ্কার করে পার্থ বলবে, বেশ ভূমিকা করেই বলবে, মানুষের পরীক্ষাই হল বিপদের দিনে। যে মানুষ যে কোনো পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে সেই তো সুখী। সুখ টাকায় নেই, সুখ পদমর্য্যাদায় নেই, যশ আর খ্যাতিতে নেই। সুখ আছে মনে। এই ধর না আজ আমরা সুসজ্জিত ঘরে ভোজ টেবিলে বসে যে আনন্দ পাচ্ছি, সেই একই আনন্দ যদি ফুটপাতে বসে পাই, তবেই না আমরা মানুষ।

কিন্তু ময়দানে বসে এইসব সাতপাঁচ না ভেবে সোজা বাড়ি গেলেই তো হয়। ভয় কিসের। পরিস্থিতিকে নিজের অনুকূলে আনতে হবে। ঘটনাপ্রবাহে ভেসে গেলে তো চলবে না। পার্থ সেন জীবন বড় সোজা জিনিষ নয়। জীবনকে চালাতে হলে জাহাজের ক্যাপটেনের মতো দক্ষতা চাই। এই মুহূর্তে, পাশে যদি অপর্ণা থাকত! দুজনে বসে থাকতুম পাশাপাশি, গুমোট ভাবনাদের নিয়ে, তারপর হয়ত শেষ ট্রেনে চড়ে হাওড়া থেকে চলে যেতুম রাঙামাটির দেশে। সেখানে মাধুকরী করে দিন

চলত। লোকে বলত, কি সুখী দম্পতি! সম্পর্কে কোথাও এতটুকু ফাটল ধরেনি। যেন হরগৌরী। সন্ধ্যেবেলা খঞ্জনি বাজিয়ে গান গাইতুম। বাঁধা বকুলের তলায় রোজ সন্ধ্যায় বসত ভাগবত পাঠের আসর। বকুল ঝরত একটি দু'টি করে। সমস্ত শরীর জুড়িয়ে যেত ঝির ঝিরে হাওয়ায়। প্রাচুর্য নেই শান্তি আছে। চাকচিক্য নেই গভীরতা আছে। অপর্ণা তুমি টেলিপ্যাথি বোঝ। এই মুহূর্তে তোমার নিউআলিপুর ফ্ল্যাটে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে শুনতে কি একটু আনমনা হয়ে যাচ্ছ? মনে হচ্ছে কি তোমাকে কেউ গভীরভাবে কামনা করছে। এখন তাহলে ওঠা যাক, কি বল পার্থ সেন? চল এবার তোমাকে আস্তে আস্তে বাড়ি পৌঁছে দি। আজ আবার তোমার গাড়ি নেই। আজ রাত, পরিকল্পনার রাত। খাওয়াদাওয়া শেষ হবে। অপর্ণা এসে বসবে তোমার খাটে পা ঝুলিয়ে। তুমি তখন আস্তে আস্তে বলবে তোমার সব কথা, তাই না? তুমি বলবে, এই ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দিতে হবে। বলবে জীবনযাত্রার মান নামাতে হবে। তুমি একটা জীবনের অন্ধকার ছবি আস্তে আস্তে আরো কালো গাঢ় রঙের পোঁচ দিয়ে তুলে ধরবে।

কোনোদিনই তো শুধু হাতে বাড়ি ঢুকিনি। আজই বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন। কিছু মিষ্টি কেন, কিছু ফুল। কাল সকালে তোমার ফুলদানী কি খালি যাবে! এখনও তোমার পকেটে কর কর করছে একশো কয়েক টাকা। ট্রামে নাইবা গেলে একটা সাটল ট্যাক্সি নাও।

এখন বেশ হাল্কা লাগছে। জানলার ধারে বসেছি। ভিক্টোরিয়ার পাশ দিয়ে সর্দারজী ছুটছে। রাতের ভিক্টোরিয়া—এক অন্য জগৎ। ফুল, ফুচকা, আইসক্রিম, ভেলপুরী, আলোকিত পুলিস আউটপোষ্ট। রঙচঙে শাড়ি, নানা বর্ণের মানুষের ইতস্তত ঘুরে বেড়ানো কেমন খুশী খুশী উৎসব উৎসব ভাব। এই সমস্যাপীড়িত কলকাতায় এ যেন এক আমোদের দ্বীপ। গো অ্যাজ ইউ লাইক। নিমেষে ট্যাক্সি এই খুশীর দ্বীপকে পিছনে ফেলে ক্যাথিড্রালকে বাঁয়ে রেখে পি. জি-র পাশ দিয়ে

আবার সেই পরিচিত, নিত্যকার কলকাতায় এসে পড়ল। হাতে ধরা রজনীগন্ধা, মৃদু গন্ধ ছড়াচ্ছে। পাশে দুই অপরিচিত ভদ্রলোক ক্রমান্বয়ে কথা বলে চলেছে। বড়বাজারে না আলুপোস্তায় মসলার ব্যবসা করে। কি একটা জিনিস কিছুদিন ধরে রাখলে কি ভাবে দাম বেড়ে গিয়ে দ্বিগুণ মুনাফা দিয়ে যাবে তারই পরিকল্পনায় ব্যস্ত। মুখে মৃদু মদের গন্ধ। সামনের আসনে দুটি ছেলে কি একটি কমপিটিটিভ পরীক্ষায় দুর্নীতির বিষয়ে উত্তেজিত আলেচনায় মুখর। ট্যাক্সি যেন তিনটে ভিন্ন জগৎ নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে নিউআলিপুরের দিকে।

অপর্ণা নামটা ছোট, বেশ মিষ্টি অন্তত আমার কাছে বেশ মিষ্টি। কোনো এক পাখী-ডাকা গ্রাম্য মধ্যাহ্নে, জীবন যখন শান্ত, লক্ষ্য যখন অস্পষ্ট, 'কেরিয়ারের' নেশা যখন ঢোকেনি, সারা রাত যাত্রার আসরে বসে থেকেও যখন মনে হয়নি কি ভীষণ সময় নষ্ট হল, তখনই এই নামটাকে ভালবেসে ফেলেছিলুম। বিভুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বই পড়তে পড়তে ভাল লেগেছিল নামটিকে। অপর্ণা যার নাম তার চেহারা কেমন হতে পারে। পাতলা, ছিপছিপে, ধারালো, চোখা নাক, টানা চোখ, নিতম্ব অবধি লুটানো চুল, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, লক্ষ্মীর মতো দুটি পা, ভারি শান্ত, সবেতেই যেন অবাক বিস্ময়। ওমা ! তাই নাকি ! ছোটোদের সঙ্গে ভারি ভাব। দিদি, মা, সখী সব মিলিয়ে মিশিয়ে এক বিস্ময়কর কিছু।

মা এসে বললেন, মেয়ে দেখেছি পার্থ। এবার তোকে বিয়ে করতে হবে। আরে ছি ছি, এখনই বিয়ে, তাছাড়া আজকালকার ছেলে প্রেম না করে বিয়ে। জানা নেই শোনা নেই। আহা না হয় বিয়ের পরই প্রেম করবি। মেয়েটির ভাল নাম অপর্ণা। লেখাপড়া জানে, দেখতে ভাল, শান্ত স্বভাব, বাপের একমাত্র মেয়ে, ভাল বংশ, পয়সাকড়ি আছে। অপর্ণা, অপর্ণা, সেই নাম। হয়ত কল্পনার অপর্ণার সঙ্গে মিলতেও পারে। সত্যি মিলেছে ? হুবহু মিলেছে। কি জানি ভাগ্যে কার কি আছে। মা চলে

গেছেন। যাবার আগের দিন বলেছিলেন—পার্থ বড় শান্তি নিয়ে যাচ্ছি রে, তোর কোন কষ্ট হবে না, বৌমা বড় লক্ষ্মীমন্ত। তোরা সুখে থাক।

মা কাল অবধি বেশ সুখে ছিলুম। আজ বড় দুঃসংবাদ নিয়ে তোমার অপর্ণার সামনে দাঁড়াব। তুমি শক্তি দাও। জীবনকে আবার নতুন জীবিকার কোটরে রাখতে হবে। সে কি সহজ কাজ? চার বছর আগে মা চলে গেছেন। আজ তাঁকে কাছে পেলে কি দারুণ হত? একটা প্রণাম করে আবার ঝাঁপিয়ে পড়তাম সমুদ্রের লোনা জলে। কিন্তু সেই অদৃশ্য লোক থেকে আমি জানি তোমার আশীর্বাদ ঠিকই আসবে।

আজ এত রাত হল তোমার। আমি দুপুরে তিনটের পর তোমার অফিসে ফোন করেছিলুম, বললে অনেকক্ষণ বেরিয়ে গেছ। কেন অপর্ণা তুমি হঠাৎ ফোন করেছিলে। জানই তো নানা কাজে আমাকে ছুটোছুটি করতে হয়। আমার চাকরি হল ফেরিওলার চাকরি, ভদ্র ফেরিওলা। মনে মনে বললুম—চাকরিটা গেছে। আজ গভীর রাতে তুমি যখন আমার খুব কাছে আসবে। ফিকে সবুজ আলো সিলিং থেকে নাইলনের মশারি বেয়ে পালকের মতো সাদা বিছানায় ছড়িয়ে পড়বে। তুমি আর আমি নিস্তব্ধ রাতে কাছাকাছি, পাশাপাশি। প্রাত্যহিক জগৎ বাইরে বহুদূরে যেন একটা স্তব্ধ ইঞ্জিনের মতো পড়ে থাকবে। অন্যদিন, অন্য কোনো দিন, চার হাজার টাকার একটা প্রতিশ্রুতিকে,একটা স্বাচ্ছন্দ্যকে পিছনে রেখে,তোমাকে আলতো,আলগোছে বুকে তুলে নিতুম। তুমি একটা নরম কাবুলী বেড়ালের মতো একটা চার হাজার টাকা দামের পার্থ সেনের নিশ্চিন্ত বুকে আরামে পড়ে থাকতে। তোমার গায়ে সুগন্ধ, কালো শ্যাম্পু করা চুলের ঢল ঢেউয়ের মতো ছড়িয়ে আছে। তোমার হাত প্রাত্যহিক কাজের ঘষায় কর্কশ নয়। তোমার পায়ের গোড়ালী মোমের মতো নরম সাদা। কিন্তু আজ? আজ এক অন্য জগৎ, কাল সকালে অন্য এক সূর্য তোমাকে দগ্ধ করবে। আমি এখনই সে কথা বলতে সাহস পাচ্ছি না।

কি এত ভাবছ? তোমার চা জুড়িয়ে জল হয়ে গেল। তোমার বিস্কুট হাওয়া লেগে নরম হয়ে যাচ্ছে। ভাবছি অপর্ণা, এমন একটা কিছু

ভাবছি, যার স্বাদ কিছু বিচিত্র, একটু বেশী ঝাঁঝালো। আপাতত আমি একটু হাসব, একটু বেশী সহজ হব, একটু বেশী কথা বলব, বেশ প্রগল্ভ হয়ে যাবো। বেশ জলি চিয়ারফুল। তোমরা একটুও বুঝতে পারবে না, অন্তত শুতে যাবার আগে অবধি বুঝতে দেবো না-এতক্ষণ যে রাস্তায় গাড়ি ছুটিয়েছি, সেই রাস্তার শেষে রয়েছে একটা বিরাট খাদ।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে আপাতত আমি সিদ্ধার্থের সারাদিনের দুষ্টুমির কথা শুনতে চাই। কি কি করেছে সে, নতুন কি আবিষ্কার, নতুন কোনো কথা অথবা গান কিংবা কোনো খুশীর নাচ। না—সে আজ সারাদিন অসম্ভব গম্ভীর ছিল, যেন অন্য কোনো সিদ্ধার্থ। তার খেলা পড়েছিল দূরে। হতে পারে আমি এতটুকু অবিশ্বাস করছি না অপর্ণা। শিশুরা তাদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে অনেক কিছু বুঝতে পারে। অনেক দূর দেখতে পায়। শিশুরা এক পবিত্র অলৌকিক জগৎ, একটা নিখুঁত রেডিও সেট, ঘটনাতরঙ্গ অবিশ্রান্ত আছড়ে পড়ছে। সিদ্ধার্থের টেলিভিশানে ধরা পড়েছিল দুপুরের ঘটনা। সিদ্ধার্থ খেলা করেনি, হয়ত শরীর ভাল ছিল না, পেটের গোলযোগ, গ্রাইপওয়াটার দিলে পারতে দুবার। কিন্তু সিদ্ধার্থের জন্য বোধ হয় একটু বেশী ভাবছি, তাই না। শিশুর খেয়াল। খেয়ালে হাসে, খেয়ালে কাঁদে, খেয়ালে খেলে। তাই তো! ফুটপাথের মায়েরা বোধ হয় এত ভাবে না। তাই না!

খালি কাপটা নিয়ে যেতে বল শঙ্করকে। তুমি কি আরো কিছু বলবে আমাকে অপর্ণা? না কায়দা করে কাছাকাছি এসে বুঝতে চাইছ আমি মদ খেয়েছি কিনা? আগে মাঝে মাঝে যা খেয়েছি মিসেস সেন সবই ব্রাউন ব্রাদার্সের পয়সায়। পানীয় আপাতত আজই বেলা বারোটার পর থেকে আমার কাছে অত্যন্ত মহার্ঘ। রঙীন জল একটু খেয়েছি তবে সে শুধুই জল—এক বোতল রঙীন ঠাণ্ডা পানীয়।

তুমি একটা চিঠির কথা বলতে চাইছ। আজ এসেছে। কোনো সুসংবাদ। লটারি পাওয়ার খবর। তবে? আমার বোন আরতি এখানে এসে থাকতে চাইছে, তার এক ছেলে আর এক মেয়েকে নিয়ে। শ্বশুর-

বাড়ির গোলযোগ চরমে উঠেছে। প্রতাপ কাল তাকে মেরে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। কোনো এক বান্ধবীর বাড়িতে উঠেছে। চমৎকার! চমৎকার যোগাযোগ! কিন্তু অপর্ণা আমি কিছু বলার আগে তুমি কি বলছ শুনি। তোমার সামনেও এসেছে জীবনের পরীক্ষা। নিউ আলি-পুরের সাজানো ফ্ল্যাটে, অপর্ণা, পার্থ আর সিদ্ধার্থর নিটোল সংসার। বেশ প্রাচুর্যের সংসারই বলা চলে। বেশ শান্তির সংসার। শ্বশুর শাশুড়ীর সঙ্গে মানিয়ে চলার প্রশ্ন নেই। পার্থর আর কোনো ভাই নেই। সেই সংসারে বাড়তি তিনটে প্রাণ, তিনটে প্রাণীর একটি স্বতন্ত্র জগৎ আসবে। স্বাধীনতা একটু কমবে। সব সময়ে সবকিছু করা যাবে না। নিজেদের অনেক জিনিস, অনেক কথা, অনেক ইচ্ছে যা এখন খুচরো পয়সার মতো চারিদিকে ছড়ানো পড়ে আছে তা গোপন করে রাখতে হবে। সিদ্ধার্থ, পার্থ আর অপর্ণার জগৎকে একটা অস্বচ্ছ আবরণে ঢেকে দিতে হবে। ব্যক্তিগত, অন্তরঙ্গ, অনেক কিছুকেই লুকিয়ে রাখতে হবে, নির্জন কোনো একটি স্বতন্ত্র পরিবেশের অপেক্ষায়। এই পরিবেশে অপর্ণা তুমি কি করবে! তোমার স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে পারবে! না প্রাত্যহিক কলহের মধ্যে দিয়ে পথ কেটে কেটে অবশেষে একদিন সম্পর্কের রঙীন কাঁচের গোলক চুরমার করে ভেঙে দেবে!

আমি কি বলছি জান পার্থ—এই অবস্থায়, তুমি না কর না। সত্যি বিপদে পড়েছে। অমানুষ স্বামীর ঘরে পড়ে পড়ে মার খাওয়ার চেয়ে চলে আসাই ভাল। স্নেহ দিয়ে যা পাওয়া যায় না, সম্পর্কের খাতিরে তা পেতে হলে আইনের সাহায্য নিতে হবে। অপর্ণা তুমি বলছ? হাসিমুখেই বলছ ওরা আসুক! পারবে তুমি এক সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে? পার্থ তোমার ভাবনার কি আছে? তোমার বোন, সে কি আমার কেউ নয়। তার প্রতি কি আমার কোনও দায়িত্ব নেই।

বল কি অপর্ণা? এ তো আধুনিকা কোন মহিলার কথা নয়। আধুনিক সমাজে মানুষ বাস করে ক্যাপসুলে। গণ্ডী তার সীমিত। মানুষে মানুষে সম্পর্ক খুবই সঙ্কীর্ণ। এই কি সেই অপর্ণা? সবুজ

ঘাসের গালচের উপর, জলের দিকে মুখ করে যে বসে থাকত আমার পাশে! জীবনের সেই রোমান্টিক দিনগুলোয়! স্বপ্নরা নানা রঙের সুতোয় জাল বুনে যেত আমাদের ঘিরে। আমরা তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া। জীবন শুরু হয়নি। শুধুই পরিকল্পনা। বাগান কেমন হবে, ফুলের বেড কোথায় থাকবে, কোথায় ফোয়ারা, কোথায় নুড়ি ঢালা পথ। অপর্ণার বাবা ডাক্তার। অপর্ণা একমাত্র মেয়ে। পার্থ সেনের বাবা একজন অধ্যাপক। পার্থ সেন হতে চলেছে চৌখস ইঞ্জিনিয়ার। জীবনের দিন-গুলি সোনালী বালির মতো দুজনেরই মুঠোয় ধরা, খেয়াল-খুশীমত ঝুর ঝুর করে ঝরিয়ে দিলেই হয়। ঘাসের গালচে থেকে অপর্ণাকে তুলে এনেছিলাম নিউ আলিপুরের গালচে মোড়া ঘরে। পরিবেশ বাস্তব। সেখানে অপর্ণা গৃহিণী, সেখানে অপর্ণা মা। নানা সম্পর্কের সুতো দিয়ে সে বাঁধা। কর্তব্যের সূক্ষ্ম জালে সে একটা রঙীন মাকড়সা। দিন গেছে, দিন এসেছে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক থেকে রোমান্সের বিন্দুগুলো জলের মতো ঝরে গেছে। দুজনে সহজ হয়েছি। দুজনের ভাল লাগা আর না লাগা বলতে শিখেছি। একটা বোঝাপড়ার সাধারণ প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আমরা আমাদের জগৎ তৈরী করেছি। কিন্তু অপর্ণা সেই অভ্যস্ত জগতে তোমাকে যে ভাবে দেখেছি, চিনেছি বা তুমি আমাকে যে ভাবে দেখেছ, চিনেছ, তাই দিয়ে কি আমরা জোর করে বলতে পারি, যে কোনো পরিবেশেই আমরা নির্ভয়ে পাশাপাশি হাতে হাত রেখে হাসিমুখে হেঁটে যেতে পারব! তুমি তো বলছ! এর মধ্যে কোনো ফাঁকি নেই তো!

কিন্তু আমি তো তোমাকে আসল কথাটাই এখন বলিনি। সে কথা তুমি শুনতে পাবে আর একটু বেশী রাতে, চারিদিক যখন নিস্তব্ধ হয়ে আসবে, পৃথিবী যখন ঘুমিয়ে পড়বে তারা-ঝকঝকে আকাশের তলায়। আর সেই কথা শুনেও কি তুমি বলতে পারবে আরতি আসুক।

বেশ এখন আমরা রাতের খাওয়া শেষ করে নিতে পারি। কারণ রোজ আমরা এই সময়েই খাই, অন্তত সাত বছর ধরে খেয়ে আসছি। শেষবারের মতো তোমার রান্নার প্রশংসা আমি করব। হয়ত জীবনের

আগামী দিনগুলোয় তুমি আর এই সমস্ত রাঁধবার সুযোগ অনেক দিন পাবে না। কারণ প্রাচুর্যের দিন শেষ হতে চলেছে। আসছে সংগ্রামের দিন। সেই সমস্ত ছায়া-ঘেরা দিনে সূর্যের প্রতিশ্রুতিকে পিছনে রেখে সংশয়ের ছায়াকে পাশে রেখে আমাদের এগোতে হবে। আলো তো আছেই তা না হলে ছায়ারা আসে কোথা থেকে? আর একটু পুডিং খেতে পারি, তাই না অপর্ণা। আইসক্রীমের ট্রেটা ফ্রীজ থেকে আর একবার বের করে আন, হিম ধোঁয়া ছড়াতে ছড়াতে এক একটি কিউব তুলে দাও এই ডিশে। সময় সময় মনে হয় অনর্থক বিলাসিতার পায়ে নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে পরিবেশের কাছে পরাধীন হয়ে পড়েছি। এই সুদৃশ্য ভোজ-টেবিল থেকে সব সরিয়ে নিয়ে খানকতক মোটা রুটি আর একহাতা তরকারি পরিবেশন করলে পার্থ সেনের কি খুব অসুবিধে হত। তোমার কি মনে হয় অপর্ণা সেন। না তুমি তো এখন এই সব ভাববার অবকাশ পাওনি। ল্যাম্পশেডের ছায়ায় তোমাকে এখন ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। পাতলা ঠোঁট দিয়ে চুমুকে চুমুকে খাচ্ছ গরম চকোলেট, তোমার প্রিয় পানীয়। তোমার ঐ আবেশ-জড়ানো চোখে রাত্রির সমস্ত মাধুর্য গাঢ় হয়ে এসেছে। তোমার দিকে তাকিয়ে যেন এই প্রতিজ্ঞাই করতে ইচ্ছে করে দুঃখের আগুন যেন তোমাকে স্পর্শ না করে। পুরুষের সমস্ত বর্ম দিয়ে তোমাকে আগলে রাখতে হবে। তুমি যেন কোন মন্দিরের দেবী।

এইবার আর একটু পরেই সেই বাঁশী শুনতে পাব। বোধহয় কোন জাহাজের বাঁশী। আর আমরা রোজকার মতো এই পশ্চিমের বারান্দা থেকে উঠে যাবো শোবার ঘরে। এই তো আমাদের রুটিন। পশ্চিমের ঐ ফাঁকা মাঠ পেরিয়ে যে রাস্তা উত্তর-দক্ষিণে একখণ্ড তামার পাতের মতো পড়ে আছে—ঐ রাস্তা থেকে এই বাড়িটাকে একটা আলো-ঝলমল জাহাজের মতো দেখায়। একটু পরেই একটি দুটি করে আলো নিভিয়ে নিভিয়ে, আমাদের ফ্ল্যাট অন্ধকারে মিলিয়ে যাবে। বিশ্রামের সময়। আগামী দিনের জন্যে শক্তি সঞ্চয়ের সময়। শোবার ঘরের জানলায়

সিফনের পর্দা হাওয়ায় তুলছে। স্বপ্নরা যেন ডানা মেলে উড়ে উড়ে আসছে।

অপর্ণা আজ শোবার আগে আমাদের একটু কাজ আছে। হাসছ। কোন কায়িক পরিশ্রম নয়। না না, কোন রবীন্দ্র সঙ্গীতের ফরমায়েসও নয়। বস এইখানে চুপ করে। মনে হচ্ছে আমি যেন কোন এক বোয়িং প্লেনের পাইলট। অপর্ণা আমার যাত্রী। আমি বলছি। ফাস্টন্ ইওর সিট বেল্ট। ইন এ ফিউ সেকেণ্ডস উই আর ল্যাণ্ডিং। প্লেন নামছে, নামছে। জানি না টাচ ডাউন স্মুথ হবে কিনা! শেষ মুহূর্তে তলার চাকা আটকে গেলে, বেলি লেণ্ডিং হবে, একটু ঝাঁকুনি লাগবে। ফায়ার ব্রিগেড দৌড়ে আসবে প্রস্তুত হয়ে।

অপর্ণা আজ থেকে আমি সম্পূর্ণ বেকার। আমার চাকরি চলে গেছে। হাতে আছে মাত্র কয়েক হাজার টাকা। বিশ্বাস হচ্ছে না, মিথ্যে বলছি না। কাল থেকে আমাকে আর বেরোতে হবে না। কিন্তু জানো, আমাদের মাসিক খরচ প্রায় তিন হাজার টাকা। এই বাড়ি, এই ফোন, এই ফ্রীজ। কাল থেকে শুরু হবে এক নতুন দিন। কিছু অনিশ্চয়তা। কিছু হতাশা। এই পরিস্থিতিতে তুমি কি করবে।

কিছুদিন বাপের বাড়ি। ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দি, কি বল। উত্তর কলকাতা অথবা শহরতলির কোনো এক ভদ্র এলাকায় ছোটখাটো কম ভাড়ার একটা কি দুটো ঘর নেওয়া যাক। ফোনটা পরমেশের নামে ট্রানস্ফার করে দি। ব্যাবসাদার মানুষ। ফোন ছাড়া চলে না। ফ্রীজটা বিক্রি করে দি। তারপর বেশ ঝাড়া হাত পা হয়ে দেখি নতুন কি করা যায়। এরপর আরতি আসতে চাইছে। কিন্তু অপর্ণা তোমার এসব সহ্য হবে না। দুঃখের আগুনে ঝলসে যাবে। তুমি বরং কিছুদিন তোমাদের বাড়িতে থাক.যতদিন না আমি একটা কিছু যোগাড় করে উঠতে পারছি।

পার্থ তোমার এই চাকরি যাবার খবর আমি আগেই পেয়েছি। তুমি নতুন কোনো খবর আমাকে দিতে পারলে না। আর তোমার কোনো পরিকল্পনাই আমি মানতে পারছি না। প্রত্যেকটা ব্যবস্থাই তোমার

নেতিবাচক। এক—আমি বাপের বাড়ি যাব না। দুই, এ ফ্ল্যাট ছাড়বো না। তিন—দিন যেমন চলছে তেমনি চলবে।

কিন্তু কিভাবে অপর্ণা ! কোনো ম্যাজিক ! কিংবা কিছু গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছ কি ? পাওনি, তবে, তবে কিভাবে চলবে !

পার্থ আমার বাবার পরিচিত কোনো পাঞ্জাবী ভদ্রলোক বলেছিলেন—বিপদের সময় বাঙালী যেমন খরচ কমিয়ে বিপদ কাটাতে চায়, পাঞ্জাবীরা ঠিক তার উল্টো। তারা খরচ ঠিক রেখে অন্য উপার্জনের রাস্তা খোঁজে। পার্থ তোমার কি নেই ? তোমার শিক্ষা আছে. স্বাস্থ্য আছে, তোমার দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা আছে। তুমি বুদ্ধিমান। তোমার হাতে নেই নেই করে যে টাকা আছে, তার সঙ্গে আমার যা গয়না আছে সব মিলিয়ে স্বাধীন কিছু করার চেষ্টা করতে হবে। ভয় কি, পৃথিবীতে অন্য মানুষ কি ভাবে বেঁচে আছে ! কটা লোক না খেয়ে পথের পাশে মরে পড়ে আছে ?

কিন্তু অপর্ণা চাকরীর অবস্থা, ব্যবসার অবস্থা তো দেখছ। আমার মতো হাজার হাজার ইঞ্জিনিয়ার এদেশে বেকার। শিল্পে ভাঁটার টান ধরেছে। অনিশ্চিত রাজনৈতিক অবস্থা। মানুষের জীবন আজ বিশৃঙ্খল। এর মধ্যে তুমি আশার আলো কোথায় দেখলে ?

পার্থ আমি গণিতের ছাত্রী ছিলাম। আমি দেখছি আমার হাতে যে চারটি সংখ্যা আছে তার তিনটে জানা, সুতরাং চতুর্থটি আমি যে কোনো মুহূর্তে জেনে নিতে পারি। পার্থ আমার জানা, অপর্ণাও আমার অচেনা নয়, পরিবেশ আমি জানি, আমি জমির উপাদান জানি, গাছ আমার চেনা, ফল কি ফলবে, তা কি আমি জানি না ?

তুমি বলছ একটা ব্যবসার ঝুঁকি নিতে ? সঞ্চিত যে কটা টাকা আছে তা একটা অজানা ভবিষ্যতের কালো জলে ছুঁড়ে দিতে ? এরপর সেই চারে যদি মাছ না গাঁথে ? দিনের শেষে ক্লান্ত পার্থ, ফিরে আসবে খালি হাতে, ছিপ আর সুতো নিয়ে।

জীবনটাই তো ঝুঁকি পার্থ। এই মহাশূন্যে একটা গোলকের উপর

অসংখ্য শক্তির মর্জির উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকা। জন্মসূত্রেই আমরা একটা অনিশ্চয়তার ভ্রূণ নিয়ে এসেছি। ভয় কিসের? তুমি জান সমাজসেবার কাজে আমি বস্তিতে বস্তিতে ঘুরেছি। কত বিচিত্র জীবন তার জীবিকা দেখেছি। সকলেই বাঁচার জন্যে লড়ছে। আমরাও লড়ব। এত সহজে হেরে গেলে চলবে না।

অপর্ণা, সাত বছরের চাকরি জীবন আমাকে একটু নির্ভরশীল, পরাধীন করে তুলেছে। চাকরিজীবীর মনোবৃত্তি আমাকে ভীরু করে তুলেছে; কিন্তু তোমার সাহসের আলোতে আমি পথ চিনে নেবো। যে সময়, যে বুদ্ধি পরের জন্যে খরচ করেছি এখন তা খরচ করব নিজের জন্যে। তুমি রইলে আমার পাশে, সবুজ গাছের ছায়ার মতো, এই ছায়াঘেরা দিনগুলোয় তুমিই হবে জ্বলন্ত সূর্যের মতো।

পার্থ, পথে যখন নেমেছি, চলা যখন শুরু করেছি, শেষ অবধি যেতেই হবে। আমরা দুজনেই প্রস্তুত। সিদ্ধার্থকেও তৈরী করতে হবে যাতে সে প্রচণ্ড স্বাবলম্বী একটা ঘাতসহ মানুষ হয়ে ওঠে। জীবনটাই বড়, জীবনের অনুষঙ্গটা কিছুই নয়। প্রয়োজন হলে আমরা এই পরিবেশ হাসি মুখেই ছেড়ে যাবো। কিন্তু এক ইঞ্চি হটার আগে আমরা রক্তাক্ত লড়াই করব।

তাহলে কাল থেকে শুরু হোক নতুন দিন। অপর্ণা, আমি ভেবে দেখলুম, আমার বিদ্যে বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে একটা ছোটখাটো কারখানা করব। আমাদের বরানগরে যে জমিটা পড়ে আছে সেইখানেই একটা শেড্ করে। কিছু টাকা আমার আছে, আর কিছু টাকা জোগাড় করব।

তোমার পরিকল্পনা নিখুঁত তবে আমি কিছু যোগ করতে চাই। আগেই কারখানা নয়। তুমি এই নিউ আলিপুর ফ্ল্যাটেই আমার সঙ্গে পার্টনারশিপে একটা কোম্পানী কর। প্রথমে কেনা বেচা। ব্রাউন ব্রাদার্সে তুমি যে সব জিনিস নাড়াচাড়া করতে তার বাজার তোমার জানা আছে। তোমার নিষ্ঠা আর সততা দিয়ে ঐ ঘুণ ধরা কোম্পানীকে

তুমি পিছনে ফেলে রেখে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যেতে পারবে ; এ বিশ্বাস আমার আছে।

ইতিমধ্যে আমি বাড়িতে ছাদে একটা পোলট্রি করব আর আমার মহিলা সমিতির উৎপাদন বিভাগে ফল আর সব্জি সংরক্ষণের কাজ চালু করে দেবো।

অপর্ণা, রাত বোধহয় অনেক হল। এস এবার একটু বিশ্রাম করা যাক। সারাদিন হাপরের মতো ফোঁস ফোঁস করে এবার একটু শান্তি।

এখন সব নীরব নিস্তব্ধ। সারা ঘর আবছা অন্ধকার। নেটের মশারীর মধ্যে তিনটি প্রাণীর স্পন্দনহীন দেহ। গভীর শান্তির কোলে। সব কিছু ছায়া ছায়া, বুককেস, খাট, লেখার টেবল, ড্রেসিং টেবল, দেয়ালের ছবি, ক্যালেণ্ডার। হাল্কা হাওয়ায়, হাল্কা পর্দা উড়ছে। এক জোড়া সুখী দম্পতিকে ঘিরে রাত বাড়ছে, নদীর জলের মতো, ঝিম ঝিম মিষ্টি রাত। একটি গানের কলি যেন ঘর ভরেছে, একটি সুগন্ধি ধূপ যেন গন্ধে ছেয়েছে। বহুদূর থেকে ভেসে আসছে স্তোত্রপাঠের শব্দ। ঋ রাতে সারা পৃথিবী জুড়ে চলেছে পূজোর আয়োজন। লক্ষ্য লক্ষ্য মা..ষর দুঃখ-সুখের স্পন্দন নিয়ে পৃথিবী তার কক্ষপথে ঘুরছে, ঘুরছে। ..লো আর অন্ধকার পর্যায়ক্রমে ঘুরে ঘুরে আসছে। অন্ধকারকে ভয় ..রি বলেই আলোর তপস্যা। দিন থেকে দিনে মানুষের জীবনকাহিনী ..স্তৃত, এর শেষ নেই, শুরু হয়েছিল কবে তাও জানা নেই। পার্থ আর অপর্ণা এখন ঘুমুচ্ছে সিদ্ধার্থকে পাশে রেখে। এই একটু বিরতি। আবার সেই সূর্য উঠার সঙ্গে সঙ্গে এ কাহিনীর শুরু হবে। আপাতত একটি গাঢ় রেশমী পর্দায় ঢাকা থাক রঙ্গমঞ্চ। অভিনেতারা ক্লান্ত, দর্শকেরাও ..শ্রান্ত।

———